

শাহাদাতুল কুরআন

(পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য)



হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

শাহাদাতুল কুরআন (পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য)

শাহাদাতুল কুরআন
(পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য)



হযরত মির্‌যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

শাহাদাতুল কুরআন

(পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য)

গ্রন্থসত্ত্ব

ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.

প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

মূল

হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)

ভাষান্তর

মওলানা মুহাম্মদ আকরামুল ইসলাম
মুরব্বী সিলসিলা

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ: জুন ২০২৬

সংখ্যা

২০০০ কপি

মুদ্রণে

বাড-উ-লিভস্
বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন,
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Testimony of
the Holy Quran

শাহাদাতুল কুরআন
(পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য)

by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian
The Promised Messiah and Imam Mahdi^{as}

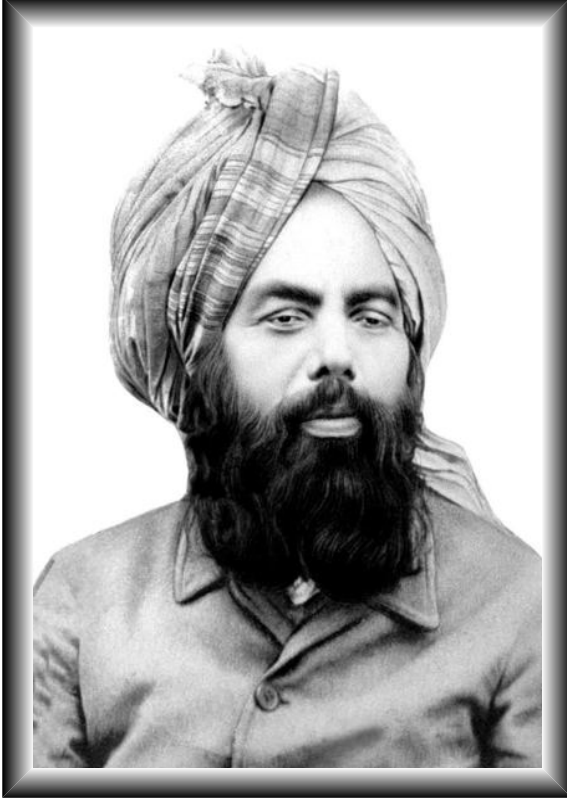
Translated into Bengali by
Maulana Muhammad Akramul Islam

1st Published in Bangladesh in June 2026

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© Islam International Publications Ltd., UK
ISBN 978-984-991-029-9

লেখক পরিচিতি



হযরত মির্খা গোলাম আহমদ (আ.) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাসে এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি একদিকে ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান ও ফলপ্রসূ লেখক, গবেষক এবং ধর্মতাত্ত্বিক; অন্যদিকে ছিলেন আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেমানুরাগী ও রসূলপ্রেমে নিবেদিত এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন, সাহিত্যকর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনা এই দুটি ধারাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করেছে। হযরত মির্খা গোলাম আহমদ সাহেব ছিলেন এক নজিরবিহীন সৃষ্টিশীল লেখক। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় ৮০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখাগুলি কেবল সংখ্যায় বিপুল নয়, বরং বিষয়বস্তুর গভীরতা, যুক্তিতর্কের বলিষ্ঠতা এবং সাহিত্যের দিক থেকেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাঁর লেখার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত আদর্শ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে

আল্লাহর পবিত্র অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া আর ইসলামের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তিনি খ্রিষ্টান মিশনারি ও আর্যসমাজীদের প্রবল আক্রমণের মুখে ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

তিনি পবিত্র কুরআনের এমনসব গভীর ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেন, যা আধুনিক যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম। এছাড়া তিনি নিজের দাবির পক্ষেও অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এই দাবির সমর্থনে ঐশী নিদর্শন ও যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

তঁাকে আরবী, ফার্সী ও উর্দু— এই তিনটি ভাষার একজন দক্ষ লেখক হিসেবে গণ্য করা হয়। তঁার আরবী রচনায় অলংকারশাস্ত্রের এমন ব্যবহার দেখা যায়, যা তৎকালীন আরবী পণ্ডিতদেরও বিস্মিত করেছিল। তঁার লেখা তর্ক, যুক্তি, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির এক অপূর্ব মিশ্রণ।

মির্য়া গোলাম আহমদ সাহেবের সাহিত্যকর্ম তঁার হৃদয়ের গভীরতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরই বহিঃপ্রকাশ, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আল্লাহর নৈকট্য ও সম্বন্ধি লাভের সাধনায় নিবেদিত। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এতটাই গভীর প্রেম ও আনুগত্য দেখিয়েছেন যে তঁার দাবি হলো— এই প্রেমের মাধ্যমেই তিনি আল্লাহর দৃষ্টিতে মসীহ মওউদের মর্যাদা লাভ করেছেন।

তিনি তঁার ঐশ্বরিক দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করে ১৯০৮ সালের ২৬ মে তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন। তঁার ইন্তেকালের পর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পুনরায় উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মওলানা হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তঁার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯১৪ সালে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মির্য়া বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে খিলাফতের আসন অলংকৃত করেন। ১৯৬৫ সালে তঁার মৃত্যুর পর হযরত হাফেয মির্য়া নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালে তঁার তিরোধানের পর হযরত মির্য়া তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। এরপর তিনি সুদীর্ঘ ২২ বছর খিলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন। ২০০৩ সালে হযরত মির্য়া মসরুর আহমদ (আই.) পঞ্চম খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত মির্য়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত এ ঐশী জামা'ত বর্তমানে বিশ্বের ২২০টি দেশে খাঁটি ইসলাম প্রচার করে চলেছে।

ভূমিকা

এ পুস্তকটির পূর্ণ নাম ‘শাহাদাতুল কুরআন আলা নুযূলিল মাসীহিল মওউদ ফী আখিরিয়্ যামান’ অর্থাৎ শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহর আগমন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য।

এর মূল বিষয়বস্তু হলো— আতা মুহাম্মদ নামে হাদীস অবিশ্বাসী এক ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে পত্র মারফত কিছু প্রশ্ন করেছিলেন, আর সেই প্রশ্নগুলোর জবাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ পুস্তকটি রচনা করেছেন। এতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রথমত, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি (আ.) কুরআন শরীফ থেকে মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদবাণী, যুগের লক্ষণাবলি এবং চতুর্দশ শতাব্দীই যে মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমনের জন্য নির্দিষ্ট তা উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও হযর (আ.) মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমনের যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এবং খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তৃতীয়ত, তিনি (আ.) তাঁর নিজের মসীহ মওউদ (আ.) হবার স্বপক্ষে পবিত্র কুরআন থেকে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, নবীদের সত্যতা নিরূপণের চিরন্তন মাপকাঠি হলো ‘ঐশী নিদর্শন’। এরপর তিনি (আ.) এমন কিছু ঐশী নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো পরবর্তীতে মানুষ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখেছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এতে ইংরেজ সরকারের প্রশংসা করেন এবং এর যৌক্তিকতা ও কারণও বর্ণনা করেছেন। একই সাথে তিনি (আ.) মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীর স্বরূপ তুলে ধরেছেন, আর এর শেষাংশে জলসার উদ্দেশ্য এবং একজন আহমদীকে তিনি কেমন দেখতে চান তা উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, এ পুস্তকটি তবলীগ ও তরবিয়তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

পুস্তকটি অনুবাদ করেছেন মওলানা মুহাম্মদ আকরামুল ইসলাম, মুরব্বী সিলসিলা। মহান আল্লাহ্ তাকে এবং অন্য যারা এ কাজে তাকে সহায়তা

করেছেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। এই পুস্তকটি বাংলার
সত্যান্বেষী মানুষের সত্য গ্রহণের পথ সুগম করবে- এটিই প্রত্যাশা।

ওয়াস্সালাম

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী.

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঢাকা

জুন ২০২৬

অনুবাদের বিষয়ে নিবেদন

মরকযী বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এ কাজে হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে খাকসারের সাথে লন্ডন, ঢাকা এবং জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত কর্মীদের একটি দল নিরলসভাবে অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছেন। তাই সংশ্লিষ্ট সবার জন্য বিনীতভাবে দোয়ার অনুরোধ করছি। আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে বলছি— পাঠকদের সামনে আমরা মূল পুস্তকের অনুবাদ সহজবোধ্যরূপে উপস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। তথাপি এক্ষেত্রে যদি কোথাও কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে থাকে তাহলে তা নিতান্তই আমাদের অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞতা ও দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকবে, তবে নির্ভুল অনুবাদ উপস্থাপনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা নিরন্তর।

আমরা পাঠকদের নিকট বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন রাখছি— আল্লাহ তা'লা যেন এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন, আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করেন এবং এসব পুস্তক যেন সত্যসন্ধানী মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা'লা লেখক, অনুবাদক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর সম্বৃদ্ধির উত্তরাধিকারী করুন এবং আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করুন, আমীন। পুস্তকটির অনুবাদ করেছেন প্রিয় মুহাম্মদ আকরামুল ইসলাম সাহেব আর এটির মানোন্নয়নে বাংলা ডেস্কের কর্মীদের পাশাপাশি জামা'তের অন্যান্য আলেমরাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব আমাদের এসব কাজে সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন, তাই তাঁর প্রতি এবং সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

ওয়াসসালাম

ফিরোজ আলম

ইনচার্জ

মরকযী বাংলা ডেস্ক

ইউকে

জুন ২০২৬

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
(১) পুস্তক রচনার প্রেক্ষাপট	১
(২) প্রথম আলোচ্য বিষয়	
হাদীসে বর্ণিত ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’- সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সর্বজনবিদিত	২
হাদীসের গ্রহণযোগ্য ও হাদীস মানার গুরুত্ব	৩
হাদীসে বর্ণিত ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’- সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর স্বপক্ষে যুক্তিপ্রমাণ	১০
(৩) দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়	১৬
মসীহ ও ঈসা নাম রাখার তাৎপর্য	১৯
সূরা কদরের ব্যাখ্যা	২০
সূরা যিলযালের ব্যাখ্যা	২১
পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতের আলোকে যুগের অবস্থা এবং লক্ষণাবলি	২৫
নুফেখা ফিস সূর তথা শিঙায় ফুঁ দেবার প্রকৃত অর্থ	২৯
মহানবী (সা.)-এর মসীলে মুসা হবার শর্ত কীভাবে পূর্ণতা পায়	৩০
পবিত্র কুরআনে ‘মিনকুম’ শব্দটি সর্বজনীন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে	৪০
পবিত্র কুরআনের হিফায়ত তথা সংরক্ষণের প্রকৃত তাৎপর্য	৫০
খলীফা ও মুজাদ্দিদের কাজা পবিত্র কুরআনের সুরক্ষা করা	৫১
মুজাদ্দি ও মুহাদ্দাস প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা	৫৪
পবিত্র কুরআনের বর্তমানেরও শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা	৫৯
উম্মতে মুহাম্মদীয়াতের জন্য আল্লাহ্ চিরস্থায়ী খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন	৬৮
পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই যুগ ও ঈসা (আ.)-এর যুগ সাদৃশপূর্ণ	৭৫
(৪) তৃতীয় আলোচ্য বিষয়	৮০
এ উম্মতের মধ্যে থেকেই মসীহ নামের এক ব্যক্তি আগমনের প্রথম কারণ	৮০
দ্বিতীয় কারণ	৮১
নবীদের দাবির সত্যতা যাচাইয়ের আল্লাহ্ নির্ধারিত আদি রীতি	৮৪
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ ঐশী নির্দেশনাবলি	৮৬
হযরত ঈসা (আ.)-এর মুজিয়াসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য	৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশের অপেক্ষায় থাকা কতিপয় মহানিদর্শন	৯৪
(৫) সরকারের মনোযোগের দাবি রাখে	৯৮
মুহাম্মদ হোসেন বাটলভীর স্বরূপ উন্মোচন	৯৮
রাজনৈতিক সমালোচনার উত্তর	১০৪
উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত গুরুত্বপূর্ণ ৩টি পত্র	১০৭
(৬) ১৮৯৩ সনের জলসা মূলতবির কারণ	১১৫
জলসার উদ্দেশ্য	১১৫
জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মহামূল্যবান উপদেশমালা	১১৫
দ্বিতীয় কারণ	১২২
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রশংসায় বানার্ভা নিবাসী রহমত আলী সাহেবের লেখা ফার্সি কবিতা	১২৪

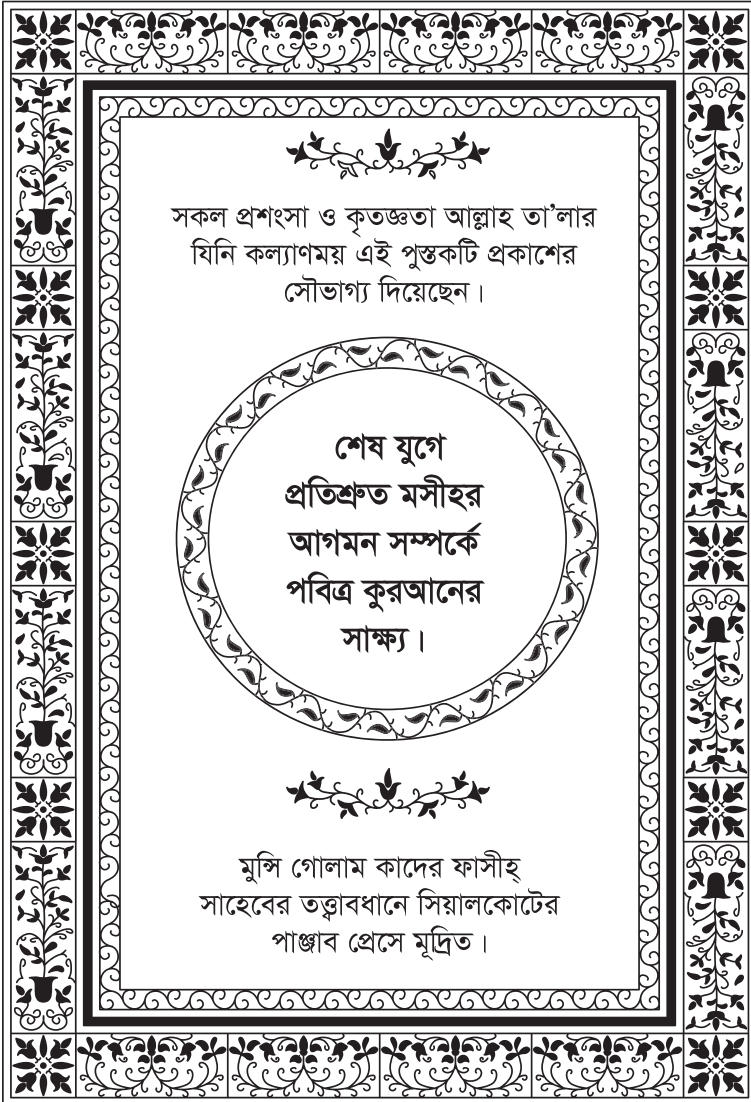
الحمد لله والمنة لله
المسماة به



مطبع پنجاب پریسیا لکھنؤ میں باہتمام
نشی غلام قاسم صاحب
نصیح کے چھپا

قیمت ۶۶

۱۸۹۷ سالے মুদ্রিত শাহাদাতুল কুরআনের মূল শিরোনাম পৃষ্ঠার প্রতিক্রপ



সংখ্যা: ৭০০

মূল্য: ৬ আনা

শাহাদাতুল কুরআনের মূল শিরোনাম পৃষ্ঠার অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

প্রতিশ্রুত মসীহ

আতা মুহাম্মদ নামের এক ভদ্রলোক ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ছাপানো একটি পত্র মারফত আমার কাছে জানতে চান, আপনিই যে প্রতিশ্রুত মসীহ অথবা কোনো মসীহর অপেক্ষা করা আমাদের জন্য আবশ্যিক কর্তব্য—এর কী প্রমাণ রয়েছে?

এখানে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে তা হলো, আপত্তিকারী মহোদয় বিশ্বাস করেন, ‘পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে হযরত ঈসা (আ.) সত্যিকার অর্থেই মৃত্যুবরণ করেছেন’। ‘কিন্তু এই উম্মতের মাঝে ঈসা নামের কেউ আসবেন’—একথাটি তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, বিভিন্ন হাদীসে এর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে ঠিকই, কিন্তু হাদীসের এসব বর্ণনাকে তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করেন না বরং তিনি বলেন— ‘এসব হাদীস তো দীর্ঘদিন পর সংকলিত হয়েছে এবং অধিকাংশ সংকলনই খবরে আহাদ* আর বিশ্বাসের অযোগ্য।’ এজন্য হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনবার্তাকে তিনি সঠিক বলে মনে করেন না। এছাড়া যে-সব সংবাদ শুধু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে তিনি ভিত্তিহীন ও নিরর্থক বিষয় বলে মনে করেন; তাঁর দৃষ্টিতে এগুলোর কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। কাজেই এখানে তাঁর রুচিসম্মত উত্তর দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয় হবে। অতএব সহজ ভাষায় বললে এক্ষেত্রে মূলত তিনটি বিষয় স্পষ্ট করার দাবি রাখে।

প্রথম বিষয়টি হলো, বিভিন্ন হাদীসে প্রাপ্ত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমন বার্তা কি কেবল এজন্যই বিশ্বাসের অযোগ্য বলে গণ্য হবে যে, (তার দৃষ্টিতে) হাদীসসমূহের বর্ণনা বিশ্বাসের অযোগ্য ও পরিত্যাজ্য?

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, পবিত্র কুরআনে কি এ ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়— নাকি পাওয়া যায় না?

[* টীকা: যে সহীহ হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রতি যুগে সর্বোচ্চ তিনজন থেকে সর্বনিম্ন একজন পর্যন্ত বিদ্যমান, এমন হাদীসকে খবরে আহাদ বা খবরে ওয়াহেদ বলা হয়। —অনুবাদক; তথ্যসূত্র: রিয়াদুস সালাহীন, ১ম খণ্ড]

তৃতীয় বিষয়টি হলো, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যদি প্রমাণিত একটি সত্য বিষয় হয়ে থাকে তাহলে এ অধমই সেই ব্যক্তি যে এর সত্যায়নকারী বা যার সত্যায়ন এগুলো পূর্ণতা পেয়েছে— এর কী প্রমাণ রয়েছে?

অতএব প্রথমে আমরা এ তিনটি প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিভিন্ন হাদীসে প্রতিশ্রুত মসীহর (আগমন)-সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান থাকার বিষয়টি পৃথিবীর কেউই অস্বীকার করে না, বরং হাদীসের বর্ণনা অনুসারে ‘ঈসা ইবনে মরিয়ম’ নামের এক ব্যক্তি অবশ্যই যে আসবেন— এ বিষয়ে প্রায় সব মুসলমানই একমত। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এত ব্যাপকহারে বিদ্যমান যা একজন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের আত্মিক প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট এবং যা মানুষকে একজন প্রতিশ্রুত মসীহর আগমন-সংক্রান্ত এরূপ সর্বজনীন বিষয়ে ঈমান আনতে বাধ্য করে। যদিও সত্য কথা হলো, অধিকাংশ হাদীসই নিজ অবস্থানের নিরিখে ‘খবরে আহাদ’-এর উর্ধ্বে নয়। তথাপি বিভিন্ন সূত্রে এ সংক্রান্ত যতগুলো হাদীস সংকলিত হয়েছে, সেগুলোকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা হলে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনের সংবাদ অবশ্যই প্রদান করেছেন আর এতে কোনো সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

এছাড়াও আমরা যখন আহলে সুন্নত ওয়াল জামা’ত স্বীকৃত এসব হাদীসের সাথে ইসলামের অন্যান্য ফিরকা, যেমন শিয়া ও অন্যরা যে-সব হাদীসে বিশ্বাসী— সেগুলোও যুক্ত করি, তখন হাদীসের এই ধারাবাহিকতার যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা আরো বেশি প্রমাণিত হয়। আবার এর সাথে যদি সুফি-সাধকদের শত শত বইপুস্তক মিলিয়ে দেখা হয় তাহলে সেগুলোকেও এর আনুকূলেই সাক্ষ্য দিতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে ইসলামের বাইরে আহলে কিতাব, অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের গ্রন্থাদিও আমরা যখন পাঠ করি, তখন তা থেকেও এ তথ্যই পাওয়া যায়। একই সাথে ইলিয়াস (আ.)-এর আকাশ থেকে অবতরণ সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.)-এর সিদ্ধান্তও ইনজীল থেকে জানা যায় আর তা হলো, এ ধরনের সংবাদ কখনোই আক্ষরিক হয় না। কিন্তু সকল যুগেই প্রতিশ্রুত মসীহর এই আগমন বার্তা এত বিস্তৃত বলে মনে হয় যে, এর ধারাবাহিকতা অস্বীকার করার ন্যায় চরম অজ্ঞতা আর কিছুই হতে পারে না। আমি সত্য সত্য বলছি, ইসলামের যে-সব বইপুস্তকে এ সংবাদটি

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে এসেছে সেগুলোকে শতাব্দীর ক্রমধারায় সাজিয়ে একত্র করা হলে এসব পুস্তকের সংখ্যা সহস্র সহস্র হবে। তবে ইসলামী বইপুস্তক সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ এক ব্যক্তিকে একথা বোঝানো খুবই কঠিন কাজ। মূলত যারা এ ধরনের আপত্তি করে, তারা আসলে নিজেদের দুর্ভাগ্যের কারণে এমন অজ্ঞ হয়ে থাকে, অর্থাৎ কোনো একটি ঘটনা কতটা জোরালো ও অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ-সংবলিত- তা অনুধাবন করার মতো জ্ঞানগরিমাই তাদের থাকে না। কাজেই আপত্তিকারী মহোদয় হয়ত এভাবেই কারো কাছে শুনে থাকবেন যে, অধিকাংশ হাদীস ‘খবরে আহাদ’-এর পর্যায়ভুক্ত আর এতেই তিনি কালবিলম্ব না করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন ছাড়া ইসলামস্বীকৃত যত গ্রন্থাদি রয়েছে, এর সবই ভিত্তিহীন সংশয়-সন্দেহ ছাড়া কিছু নয় আর এর মাঝে বস্তুনিষ্ঠ এবং নিশ্চিত বলতে কিছুই নেই। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটি একটি বিরাট ভ্রান্তি- যার প্রথম ফলাফলই হলো ধর্ম ও ঈমান ধ্বংস হওয়া। কেননা একথা যদি সত্য হয় যে, মুসলমানদের নিকট পবিত্র কুরআন ব্যতীত অন্য যে-সব হাদীস বা তফসীরগ্রন্থ রয়েছে সেগুলোর সবই মিথ্যা, অসত্য, বানোয়াট, মনগড়া ও কল্পিত কাহিনির ভাণ্ডার মাত্র, তাহলে তো ইসলামের অতি সামান্য অংশই অবশিষ্ট থাকবে। এর কারণ হলো, নবীর হাদীস থেকেই আমাদের ধর্মের বিস্তারিত বিবরণ হস্তগত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এই নামাযের কথাই ধরুন, যা আমরা (দিনে) পাঁচবার পড়ে থাকি। পবিত্র কুরআন থেকে এর ফরয হওয়া সাব্যস্ত হলেও এর কী প্রমাণ রয়েছে যে, সকালে দুই রাকাত ফরয ও দুই রাকাত সুন্নত, যোহরে চার রাকাত ফরয এবং চার রাকাত ও দুই রাকাত সুন্নত, মাগরিবের তিন রাকাত ফরয এবং এশার ফরয চার রাকাত। অনুরূপভাবে যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলেও আমরা সম্পূর্ণরূপে হাদীসের মুখাপেক্ষী। ইবাদতবন্দেগী, ব্যাবসাবাণিজ্য, পারস্পরিক চুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত এমন হাজারো (ধর্মীয়) বিষয়াদি রয়েছে, যেগুলো এতটা সর্বজনবিদিত যে, এগুলো লিপিবদ্ধ করা সময় নষ্ট করা এবং কথা বাড়ানোরই নামান্তর। এছাড়া এসব হাদীসই ইসলামী ইতিহাসের মূল উৎসও বটে। তাই হাদীসের বর্ণনা বিশ্বাস করা না গেলে একথাও আমাদের নিশ্চিতরূপে মানা উচিত নয় যে, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) আসলেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলেন আর মহানবী (সা.)-

এর মৃত্যুর পর তারা উক্ত ক্রমানুসারেই খিলাফত লাভ করেন এবং একই ক্রমধারায় তাঁদের মৃত্যুও হয়। কেননা হাদীসের বর্ণনায় যদি বিশ্বাস স্থাপন করা না হয় তাহলে এসব মহান ব্যক্তির অস্তিত্বও নিশ্চিতরূপে স্বীকার করার কোনো উপায় থাকে না। এমতাবস্থায় ধরে নিতে হবে— এসব নাম মনগড়া। আসলে আবু বকর বা উমর অথবা উসমান কিংবা আলী নামের কেউ ছিলেনই না। এর কারণ হলো, আপত্তিকারী মিঞা আতা মুহাম্মদ সাহেবের মতে এসব হাদীস হলো ‘খবরে আহাদ’ এবং পবিত্র কুরআনের কোথাও এসব নামের উল্লেখ নেই, তাহলে এ নীতি অনুসারে (উক্ত নামগুলো) কীভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব? অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমিনা, দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব এবং মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিণীদের একজন খাদিজা আর একজন আয়েশা ও একজনের নাম হাফসা রাযিআল্লাহু আনহুনা আর দুধ মাতার নাম হালীমা হওয়া; এছাড়া মহানবী (সা.)-এর হেরা গুহায় ইবাদত করা, কিছু সংখ্যক সাহাবীর হাবশা বা ইথিওপিয়াতে হিজরত করা, নবুওয়ত লাভের পর মহানবী (সা.)-এর ১০ বছর পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করা এবং এমনসব যুদ্ধ হওয়া, যেগুলোর নামগন্ধও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই— এসব বিষয় কেবল হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয়। অতএব ‘হাদীস কোনো বিষয়ই নয়’— মর্মে খোঁড়া যুক্তি মেনে নিয়ে কি এই সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করা সম্ভব? একথা সত্য হলে মুসলমানদের পক্ষে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনী হতে কোনো কিছুই বর্ণনা করা সম্ভব হবে না। কাজেই আমরা যদি আমাদের নেতা ও মনিব মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনচরিতের সেই ধারাবাহিকতা দেখতে চাই, অর্থাৎ “নবুওয়ত লাভের পূর্বে মক্কায় তিনি (সা.) কেমন জীবনযাপন করেছেন, কোন সালে নবী হবার দাবি করেন, কোন ক্রমধারায় মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়, মক্কার কাফেররা ১০ বছরে কী কী ধরনের কষ্ট দিয়েছিল, অতঃপর কীভাবে ও কী কারণে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কতগুলো যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় কোন কোন দেশে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তার ঘটেছিল, সমসাময়িক রাজাবাদশাকে তিনি (সা.) ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন কিনা, আর লিখে থাকলে এর ফলাফল কী হয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে ইসলামের কোন কোন বিজয় অর্জিত হয় এবং কী কী সমস্যা দেখা দেয়, হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে কোন কোন দেশে

ইসলামের বিজয়ের গাণ্ডি বিস্তৃত হয়—” এসব বিষয় কেবল হাদীস ও সাহাবীদের উক্তি থেকেই জানা যায়। অতএব হাদীসের কোনো মূল্যই যদি না থাকে তবে সেই যুগের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া শুধু কষ্টসাধ্য বিষয়ই নয় বরং অসম্ভব। এমতাবস্থায় বিরুদ্ধবাদীরা মহানবী (সা.) এবং সাহাবা রিয়ওয়ানুল্লাহি আলাইহিমের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে সব ধরনের মিথ্যা অপবাদ আরোপের সুযোগ পাবে। এছাড়া শত্রুদের অন্যায় আক্রমণের অনেকটা সুযোগ আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করে দেবো এবং আমাদের মেনে নিতে হবে যে, এসব হাদীস থেকে যে-সব ঘটনা ও জীবনী সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়— তার সবই মূল্যহীন ও বৃথা; এমনকি সাহাবীদের নামও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। মোটকথা, হাদীসের মাধ্যমে আমরা নির্ভরযোগ্য ও সুনিশ্চিত কোনো সত্য পেতেই পারি না। এমন ধারণা পোষণ করা তো ইসলামের বৃহৎ একটি অংশকে নিজ হাতে ধ্বংস করার নামান্তর। বরং প্রকৃত ও সঠিক বিষয়টি হলো, হাদীসের মাধ্যমে যে-সব বিষয় বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে কুরআন শরীফ যথার্থ ও সুস্পষ্টভাবে অবস্থান ব্যক্ত না করা পর্যন্ত তা মেনে নেওয়া আবশ্যিক কেননা এটি স্বীকৃত বিষয় যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সত্য কথা বলে থাকে আর একান্ত বাধ্য হয়েই সে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং এটি তার জন্য অস্বাভাবিক বিষয়। এছাড়া যে-সব হাদীস বিশ্বাস ও কর্মের অংশ হয়ে মুসলমানদের বিভিন্ন দলের পরিচিতির প্রতীকে পরিণত হয়েছিল, সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতা ও নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরা সম্বন্ধে মন্তব্য করাটা আসলে একপ্রকার উন্মাদনা ও পাগলামি বইকি। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি এখন এ বিতর্কের অবতারণা করে যে, মুসলমানরা পাঁচ বেলায় যে পাঁচ নামায পড়ে, সেগুলোর রাকাত সংখ্যা একটি সন্দেহপূর্ণ বিষয়। যেমন- পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াতে উল্লেখ নেই যে, ‘তোমরা ভোরে দু-রাকাত, জুমুআর নামাযে দু-রাকাত এবং দুই ঈদেও দু-রাকাত করে নামায পড়বে।’ বাকি রইল হাদীস, কিন্তু এর অধিকাংশই তো ‘খবরে আহাদ’ যা ধর্মীয় বিশ্বাস দৃঢ় করার ক্ষেত্রে কোনো উপকারই সাধন করতে পারে না, তাহলে এমন কুতর্কে লিপ্ত ব্যক্তি কি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য হবে? হাদীস সম্বন্ধে যদি এমন অভিমতই গ্রহণ করা হয় তবে নামাযই সর্বপ্রথম হাতছাড়া হয়ে যায়, কেননা পবিত্র কুরআন তো নামায পড়ার কোনো রূপরেখা অঙ্কন করে দেখায় নি, বিভিন্ন হাদীসের নির্ভরযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করেই এই নামাযগুলো পড়া হয়। এখন যদি কোনো বিরুদ্ধবাদী আপত্তি

করে বলে, কুরআন শরীফ তো নামায পড়ার কোনো নিয়মনীতি শিক্ষা দেয় নি আর মুসলমানরা (নামাযে) যে রীতিনীতি অবলম্বন করছে তা পরিত্যাজ্য, কেননা হাদীস বিশ্বাসযোগ্য নয় আর ‘নিঃসন্দেহে হাদীসের কোনো গুরুত্বই নেই’- এ নীতিতে আমরা নিজেরাও বিশ্বাসী হলে এই আপত্তিটি মেনে নেওয়া ছাড়া আমরা আর কী উত্তর দিতে পারি? বরং এমতাবস্থায় ইসলামের ‘জানাযার নামায’-ও নিছক বৃথা কাজ বলেই বিবেচিত হবে, কেননা কুরআন শরীফের কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে, এমন কোনো নামাযও রয়েছে যাতে রুকু ও সিজদা নেই। এখন চিন্তা করে দেখুন! হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করলে ইসলামের কী অবশিষ্ট থাকে?

এ বিষয়টিও আসলে সঠিক চিন্তার অভাবেই মাথাচাড়া দেয় যে, কেবল এক বা দুই ব্যক্তির বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান করে তাদের রেওয়ায়েতকেই মহানবী (সা.)-এর বক্তব্য মনে করাই হলো হাদীসের সারকথা। বরং প্রকৃত সত্য হলো, হাদীস ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার একটি শাখা এবং সংগঠিত ঘটনার ধারাবাহিকতাস্বরূপ। উদাহরণস্বরূপ, হাদীস বিশারদরা দেখলেন, কোটি কোটি মানুষ মাগরিবের ফরয নামায তিন রাকাত পড়ে এবং ফজরে পড়ে দু-রাকাত, আবার প্রত্যেক রাকাতে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করে আর আমীনও বলে; কেউ উচ্চৈঃশব্দে আর কেউবা মনে মনে, শেষ বৈঠকে আত্মাহুয়্যা তু পড়ে এবং এর সাথে দরুদ ও অন্যান্য কতিপয় দোয়াও পাঠ করে আর এরপর দুদিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে। কাজেই ইবাদতের এ রীতি দেখার পর হাদীস বিশারদদের মাঝে বিচারবিশ্লেষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে নামাযের এসব রীতিনীতির পরম্পরাকে মহানবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছানোর এবং সহীহ, মারফু ও মুত্তাসিল* হাদীস দ্বারা প্রমাণ করার উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। যদিও একথা সত্য যে,

* টীকা: ১। সহীহ হাদীস: হাদীসের শুদ্ধতা বিচারের সমস্ত মাপকাঠিতে কোনো হাদীস যদি ঋতিমুক্ত প্রমাণিত হয় তবে তাকে সহীহ হাদীস বলে। ২। মারফু হাদীস: যে হাদীসের সনদ বা বর্ণনাকারীর ধারা বা শৃঙ্খল রসুলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং যা মহানবী (সা.)-এর হাদীস হিসেবে গৃহীত হয়েছে তাকে মারফু হাদীস বলে। ৩। মুত্তাসিল হাদীস: যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো স্তরেই কোনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে নি এবং প্রত্যেকের নাম যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে সেটিকে মুত্তাসিল হাদীস বলে -অনুবাদক।

তাঁরা এরূপ ধারাবাহিকতা সংকলনের ক্ষেত্রে এক একটি হাদীসের বিষয়বস্তুর জন্য এক হাজার বা দুই হাজার সনদ উপস্থাপনের চেষ্টা করেন নি। তাই বলে কি একথাও সত্য যে, সেসব হাদীসের সংকলকই নামাযের গোড়াপত্তনকারী আর এর পূর্বে পৃথিবীতে নামায পড়া হতো না এবং জগদ্বাসীও নামায সম্পর্কে কিছুই জানত না আর কয়েক শতাব্দী পর শুধু দু-একটি হাদীসে বিশ্বাসের মাধ্যমেই নামায আরম্ভ হয়ে গেছে? অতএব আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলছি, এমন ধারণা করা হলে এটি হবে একটি বিরাট আত্মপ্রতারণা যে, সেই গুটি কতক হাদীসই নামাযের এই রাকাত ও নামায পড়ার রীতিসমূহ প্রমাণের মূলভিত্তি যেগুলোকে বাহ্যদৃষ্টিতে খবরে আহাদের চেয়ে বেশি কিছু মনে হয় না। একথা সত্য হলে সর্বপ্রথম ইসলামের বিভিন্ন ফরয তথা আবশ্যিক কর্তব্যগুলো এমন এক কঠিন ও সমাধানের অযোগ্য সমস্যার সম্মুখীন হয় যা একজন আত্মাভিমानी মুসলমানের কাছে সবচেয়ে বড়ো চিন্তার বিষয় হয়ে থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এমন ধারণা কেবল সেসব লোকই পোষণ করতে পারে যারা জীবনচরিত, ঘটনাপ্রবাহ, রীতিনীতি ও ইসলামের ইবাদতসমূহ কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে দৃঢ়বিশ্বাসের মর্যাদায় উপনীত হয়েছে কখনো চোখ-কান খুলে দেখে নি।

অতএব জেনে রাখা আবশ্যিক, জাতিগত আমল তথা ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতাই হলো এই দৃঢ়বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার পরম স্বস্তিদায়ক দৃষ্টান্ত। উদাহরণস্বরূপ, যে-সব হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় ফজরের নামায এত রাকাত এবং মাগরিবের নামায এত রাকাত, সেগুলোকে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, এমন হাদীসের সংখ্যা দুই কিংবা তিনটি আর এগুলো খবরে আহাদের চেয়ে বেশি কিছু নয়— তবে কি এই অনুসন্ধান ও গবেষণার পূর্বে মানুষ নামায পড়ত না? অধিকন্তু বিভিন্ন হাদীসের যাচাই-বাছাই ও রাবীদের (তথা বর্ণনাকারীদের) পরিচয় লাভ করার পরই কি নামায আরম্ভ হয়েছিল? প্রকৃত কথা হলো, কোটি কোটি মানুষ এভাবেই নামায পড়ত। হাদীসের সনদগত ধারাবাহিকতার কোনো অস্তিত্ব যদি না-ও থাকত তাহলেও আমল বা কর্মের নিরবচ্ছিন্ন এ ধারা থেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, নামাযসংক্রান্ত ইসলামের এই ধারাবাহিক শিক্ষা যুগ যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এভাবেই চলে আসছে। তবে হ্যাঁ! হাদীসের মারফু ও মুত্তাসিল সনদগুলো এই ধারাবাহিকতার জন্য সোনায সোহাগা হিসেবে কাজ করেছে। কাজেই বিভিন্ন

হাদীসকে যদি এভাবে দেখা হয়, তাহলে যে-সব হাদীসের সাহায্য ও সমর্থনে আমলের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে সে-সবের অধিকাংশকে খবরে আহাদ বলে উল্লেখ করাটা বড়ো ধরনের ভ্রান্তি হবে। মূলত এটিই একটি বিরাট ভ্রান্তি যা বর্তমান যুগের প্রকৃতিবাদী মানুষগুলোকে ইসলামের সত্যতা হতে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাদের ধারণামতে ইসলামের যে-সব সুন্নত, রীতিনীতি, ইবাদতবন্দেগী, জীবনচরিত এবং ইতিহাসে হাদীসের বরাত টানা হয় তা যেন অল্প কিছু হাদীসের ওপর ভিত্তি করেই করা হয়ে থাকে! অথচ এটি তাদের স্পষ্ট ভ্রান্তি। বরং যে-সব আমল বা রীতি আমাদের নবী (সা.) স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা কোটি কোটি মানুষের মাঝে এমনভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে, পৃথিবীতে কোনো মুহাদ্দেস তথা হাদীস বিশারদের নামগন্ধ না থাকলেও এর কোনো ক্ষতি হতো না। একথা সবাই মানতে বাধ্য যে, এই পরম পবিত্র শিক্ষক ও রসূল (সা.) স্বীয় শিক্ষার বিষয়গুলোকে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি, যা কেবল দু-চারজন লোককেই শেখানো হবে আর বাকি সবাই এ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। এমনটি হলে ইসলাম এত বেশি বিকৃত হয়ে যেত যে, কোনো মুহাদ্দেস তথা হাদীস বিশারদ প্রমুখের হাতে এর সংশোধন কখনোই সম্ভব হতো না। হাদীসের ইমামগণ ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে হাজার হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করলেও প্রশ্ন হলো, এমন কোনো হাদীস কি আছে যা লিপিবদ্ধ করার পূর্বেই সেটির ওপর আমল করা হয় নি এবং যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশ্ববাসী অনবহিত ছিল? এমন কোনো শিক্ষা বা ঘটনা কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাস যদি থেকে থাকে যার ভিত্তি কেবল কোনো রেওয়ায়েতের ওপর নির্ভর করে হাদীসের ইমামগণ রচনা করেছেন এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোটি কোটি মানুষের তাতে অভ্যস্ত হবার কোনো প্রভাব ও চিহ্নও দেখা যায় না আর পবিত্র কুরআনেও এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না তাহলে এমন ‘খবরে ওয়াহেদ’ নিঃসন্দেহে বিশ্বাসের মানদণ্ডে অনেক নিম্নমানের হবে যেগুলো এক-দেড়শ বছর পর সংকলিত হয়েছে আর এগুলোর অনির্ভরযোগ্য হবার বিষয়ে যা-ই বলা হোক না কেন তা সঠিক। তবে এ ধরনের হাদীস আসলেই ধর্ম ও ইসলামের সাথে তেমন ঘনিষ্ঠ কোনো সম্পর্ক রাখে না; বরং ভেবে দেখলে দেখা যাবে, হাদীসের ইমামগণ এ ধরনের খুব কম হাদীসই উল্লেখ করেছেন, যেগুলোকে ধারাবাহিকভাবে কর্মে রূপায়ণের কোনো নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব এ ধারণা আদৌ সঠিক নয়, যেভাবে

কিছু অজ্ঞ লোক মনে করে যে, জগদ্বাসী ধর্মের শত শত জরুরি মাসলা-মাসায়েল এমনকি নামায-রোযাও কেবল বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য ইমামগণের হাদীস থেকে শিখেছে তাহলে মানুষ কি এক-দেড়শ বছর পর্যন্ত বে-দ্বীন ছিল? তারা কি নামায পড়ত না, যাকাত দিত না, হজ্জ করত না এবং বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত ইসলামী ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তারা কি অজ্ঞ ছিল? অসম্ভব, মোটেও এমনটি হতে পারে না। এই আশ্চর্যজনক আহাম্মকের ধ্যানধারণা কেবল কোনো নির্বোধ ব্যক্তিই পোষণ করতে পারে। অতএব বুখারী, মুসলিম ও হাদীসের অন্যান্য ইমামগণের যুগের পূর্বেও ইসলাম যেহেতু তেমনই সবুজ-শ্যামল ছিল, যেমনটি তাঁদের হাদীস-সংকলনের পর রয়েছে সেহেতু একতরফা এরূপ ধারণা পোষণ করাটা কত বড়ো অশোভন ও অবুঝের কাজ যে, বর্তমান যুগে ইসলামের যে অংশকে হাদীস আখ্যায়িত করা হয়— তা কেবল দ্বিতীয় শতাব্দীর কিছু রেওয়ায়েতের ভিত্তিতেই বিস্তার লাভ করেছে। বিরোধীদের কথা বাদই দিলাম, পরিতাপের বিষয় হলো! আমাদের ধর্মাবলম্বী অজ্ঞ লোকেরাও এই প্রতারণারই শিকার, অর্থাৎ তারা মনে করে, একটি নির্দিষ্ট যুগ অতিবাহিত হবার পর কেবল হাদীসের রেওয়ায়েতের ভিত্তিতেই অনেক মাসলা-মাসায়েল এমন লোকদের মানানো হয়েছে যারা হাদীস লিপিবদ্ধ হবার পূর্বে এসব মাসলা-মাসায়েল সম্বন্ধে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিল! বরং দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট সত্য কথা হলো, মানুষের প্রতি হাদীসের ইমামগণের অনুগ্রহ শুধু এতটুকুই যে, এক বিরাট জনগোষ্ঠী যে-সব বিষয় সূচনালগ্ন থেকেই অনুশীলনের ধারাবাহিকতায় মান্য করে আসছিল, সেগুলোর সনদ সম্পর্কে তাঁরা গবেষণা ও পর্যালোচনা করেছেন এবং দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সেই যুগের মুসলমানদের মানা ও অনুশীলিত বিষয়গুলো এমন নয় যা বিদাতরূপে ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে; বরং এগুলো সেসব কথা ও কর্মকাণ্ড যা মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের (রা.) শিখিয়েছিলেন।

পরিতাপের বিষয় হলো! নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট এ বিষয়টি অনুধাবনের ক্ষেত্রে অদূরদর্শী মানুষগুলো ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে এত বড়ো ভুল করেছে যে, এ কারণে আজ পর্যন্ত তারা হাদীসকে চরম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে আসছে। যদিও একথা সত্য যে, হাদীসের যে অংশটি মৌখিক ও ব্যবহারিক অনুশীলনের বাইরে ছিল এবং পবিত্র কুরআনের মানদণ্ডেও সত্যায়িত নয়— তা নিশ্চিত বিশ্বাসের মানে স্বীকৃতি পেতে পারে না। পক্ষান্তরে অন্য যে অংশটি

ব্যবহারিক অনুশীলনের ধারাবাহিকতায় (আমাদের কাছে) এসেছে এবং সূচনালগ্ন থেকেই যা কোটি কোটি মানুষ তাদের ব্যবহারিক রীতির মাধ্যমে সংরক্ষণ করে আসছে আর তাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে— একে কীভাবে অনুমাননির্ভর ও সন্দেহপূর্ণ বলা যেতে পারে? এক বিশাল জনগোষ্ঠীর যে ধারাবাহিক অনুশীলন, অর্থাৎ যা পুত্র থেকে পিতা, পিতা থেকে দাদা এবং দাদা থেকে পরদাদা পর্যন্ত স্পষ্টত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং আপন উৎস পর্যন্ত এর প্রভাব ও জ্যোতি দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তাতে তিল পরিমাণ সন্দেহেরও অবকাশ থাকতে পারে না। এমন ধারাবাহিক কর্মকে সবচেয়ে উত্তম মানের বিশ্বাসযোগ্য বিষয় হিসেবে বিশ্বাস করা ছাড়া মানুষের কাছে আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। এছাড়াও হাদীসের ইমামগণ যেহেতু এই ধারাবাহিক আমল বা অনুশীলনের সাথে আরো একটি ধারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সম্পাদিত আমলের সনদ পুণ্যবান ও ধর্মভীরু রাবীদের মাধ্যমে মহানবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন, তাই এ বিষয়ে বিতর্ক করা আসলে এমন সব মানুষের কাজ— যারা ঈমান সংবলিত অন্তর্দৃষ্টি ও মানবীয় বিবেকবুদ্ধির কিছুই লাভ করে নি।

এই ভূমিকার পর এখন যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া উচিত তা হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কে হাদীসে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে হাদীসের ইমামগণ শুধুমাত্র কতিপয় রেওয়ায়েতের ভিত্তিতেই লিখে দিয়েছেন আর এখানেই শেষ! এমনটি নয়। বরং এটি সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, সূচনা থেকেই এসব ভবিষ্যদ্বাণী ধর্মীয়-বিশ্বাসরূপে মুসলমানদের শিরা-উপশিরায় এমনভাবে বিরাজমান ও বিদ্যমান যে, মনে হয় যেন ধরাপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল মুসলমানই সে যুগে এই ভবিষ্যদ্বাণীর শুদ্ধতার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান ছিল, কেননা শুরু থেকেই তারা একে ধর্মীয় বিশ্বাসরূপে মেনে আসছিল। হাদীসের বিভিন্ন ইমাম, (অর্থাৎ) ইমাম বুখারী এবং অন্যরা যদি নিজেদের প্রচেষ্টায় এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কোনো কিছু উদ্ঘাটন করে থাকেন তবে তা শুধু এতটুকু যে, কোটি কোটি মুসলমানের মাঝে এ বিষয়টিকে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত দেখতে পেয়ে তাঁদের রীতিনীতির অধীনে অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুসলমানদের এসব মৌখিক কথার স্বপক্ষে রেওয়ায়েতভিত্তিক সনদ খুঁজে বের করেছেন এবং সহীহ, মারফু ও মুত্তাসিল রেওয়ায়েতের মাধ্যমে সনদগুলো তুলে ধরেছেন, যেগুলোর এক বিশাল ভাণ্ডার তাঁদের বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে দেখতে

পাওয়া যায়। এছাড়া আর কোনো কারণ পাওয়া যায় না যে, نَعُوذُ بِاللّٰهِ (আমরা আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করি -অনুবাদক) এগুলো যদি মিথ্যাচার হয়ে থাকে তাহলে মুসলমানদের এই মিথ্যাচারের কী প্রয়োজন ছিল আর কেনইবা তারা এতে একমত হলো এবং কোন বাধ্যবাধকতা তাদের এ মিথ্যাচারে প্রবৃত্ত করল? অপর দিকে আমরা অগণিত এমন হাদীসও দেখতে পাই, যেগুলোতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, শেষ যুগে এ উম্মতের আলেমরা ইহুদী স্বভাববিশিষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে থেকে বিশ্বস্ততা, খোদাভীরুতা ও আত্মিক পবিত্রতা হারিয়ে যাবে। সে যুগে ত্রুশী ধর্মের জয়জয়কার হবে এবং প্রায় সমগ্র বিশ্বজুড়ে খ্রিষ্টীয় রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটবে- (এ ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে) এসব হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ও নিশ্চিত প্রমাণাদি সামনে আসে, কেননা এ ভবিষ্যদ্বাণীটি বর্তমান যুগে পূর্ণ হবার ক্ষেত্রে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের এ যুগের আলেম সম্প্রদায় সত্যিকার অর্থেই ইহুদী সদৃশ হয়ে গেছে আর বিশ্বব্যাপী খ্রিষ্টানদের রাজত্ব ও সাম্রাজ্য এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, অতীতে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব যেখানে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ সুস্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে পূর্ণ হয়ে গেছে সেখানে দ্বিতীয় সংবাদটির সত্যতার ব্যাপারে কি কোন প্রশ্ন থাকতে পারে? প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষের কাছেই এ বিষয়টি স্বীকৃত। উদাহরণস্বরূপ, একটি হাদীস যদি ‘খবরে আহাদ’ হয় এবং সে সম্পর্কে যদি কর্ম ও অনুশীলনের ধারাবাহিকতা না থাকে, কিন্তু সেটি যদি একটি ভবিষ্যদ্বাণী-সংবলিত হয়ে থাকে যা এর নির্ধারিত যুগে পূর্ণ হয় বা এর একাংশ পূর্ণ হয়, তাহলে এরূপ হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে সন্দেহের আর কোনো অবকাশ থাকবে না। যেমন- সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ‘নারে হিজায়’ বা ‘হিজায়ের আগুন’-বিষয়ক হাদীসটি যে খবরে আহাদ এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রায় ছয়শ বছর অতিবাহিত হবার পর হুবহু পূর্ণ হয়েছে আর এর পূর্ণ হবার বিষয়টি ইংরেজরাও স্বীকার করে। এটি সেই যুগে পূর্ণ হয়েছে যখন এসব পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের পরও শত শত বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং খবরে আহাদ হবার দরুন এসব হাদীস সম্পর্কে কি নিশ্চিতভাবে গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা সম্ভব হবে? যেহেতু সেগুলোর সত্যতা প্রকাশ পেয়ে গেছে, তাই এমন ধারণা পোষণ করাটা অত্যন্ত মন্দ, খুবই ঘৃণ্য কাজ আর জঘন্য মূর্খতা হবে। অতএব মসীহ

মওউদ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ চিন্তা করলে দেখবে, এতেও কোথাও সুস্পষ্টভাবে আবার কোথাও ইঙ্গিতে এসব শব্দ বিদ্যমান যে, প্রতিশ্রুত মসীহ এমন সময় আসবেন যখন খ্রিষ্টানদের রাজত্ব ও ক্ষমতা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে, রেলগাড়ির প্রচলন হবে, অধিকাংশ জমি চাষাবাদের আওতায় আসবে, মানুষ কৃষিকাজে গভীরভাবে আগ্রহী হবে, এমনকি গরুর দাম বেড়ে যাবে। পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে খাল খনন করা হবে এবং জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তখন তা শান্তির যুগ হবে। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণীকে আমরা আমাদের এ যুগে পূর্ণ হতে দেখছি, কেননা খ্রিষ্টীয় সাম্রাজ্যের বৃহস্পতি এখন এতটাই তুঙ্গে যে, এর বিপরীতে অন্য সব রাজ্য ও রাজত্ব যেন অস্তিত্বহীন। এছাড়া রেলগাড়ি, খালের অধিক্য এবং ব্যাপক চাষাবাদও আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। এখন একটু চিন্তা করে দেখো! এই ভবিষ্যদ্বাণীতে কি সেসব অদৃশ্য বিষয় নিহিত নেই যা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে? সেই যুগে কি ইসলামের এরূপ অধঃপতনের কথা কেউ জানত, যখন কাফেরদের ওপর ইসলামী তরবারি বজ্রের ন্যায় আঘাত হানছিল? ইতঃপূর্বে যার অস্তিত্বই ছিল না, এমন নতুন বাহন সম্পর্কে অবগত করে অদৃশ্যের সংবাদ দেবার ক্ষমতা কি কোনো মানুষের আছে? চোখ মেলে দেখো এবং গভীরভাবে চিন্তা করে বলো, এই ভবিষ্যদ্বাণী কি সেসব সুমহান ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, যেগুলোর স্বরূপ ও প্রকাশের জ্ঞান কেবল আল্লাহ তা'লারই আয়ত্তে— মানুষের চতুরতা ও তার দুর্বল অভিসন্ধি এতে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না। জেনে রাখা আবশ্যিক, এসব ভবিষ্যদ্বাণীর এরূপ বিস্ময়কর এক ধারাবাহিকতা রয়েছে আর এমন এক সুনিপুণ বিন্যাস ও সুদৃঢ় শৃঙ্খলের মাধ্যমে সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান, গূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্য ও অদৃশ্য বিষয়াদিতে সজ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে, যে উচ্চতায় আরোহণ করা মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রথমত সেসব ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করেছেন যা ইসলামের উন্নতির যুগের সাথে সম্পৃক্ত ছিল আর এসব ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝেই তিনি (সা.) বলেছেন, কিসরা তথা পারস্য সম্রাটের পতনের পর আর কোনো কিসরার উত্থান হবে না এবং কায়সার তথা রোমান সম্রাট নিপাত যাবে আর এরপর আর কোনো কায়সারের জন্ম হবে না। ইসলাম উন্নতি করবে এবং বিস্তার লাভ করবে আর প্রতিটি জাতির মাঝেই এর বিস্তার ঘটবে। এরপর তিনি (সা.) বলেছেন, এ উম্মত আখেরী যামানা তথা শেষ যুগের মুখোমুখি হবে আর তখন এ উম্মতের অধিকাংশ আলেম ইহুদী সদৃশ হয়ে

যাবে। তাদের মাঝ থেকে সততা ও খোদাভীতি লোপ পেতে থাকবে; তাদের ধর্ম হবে মিথ্যা ফতোয়া দেওয়া এবং ধোঁকাবাজি ও দুরভিসন্ধি করা। এছাড়া জাগতিক লোভ-লালসায় তারা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়বে আর ইহুদীদের সাথে তাদের গভীর সাদৃশ্য থাকবে; এমনকি কোনো ইহুদী যদি নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে, তবে তারাও এমনটি করবে। অনুরূপভাবে সে যুগে খ্রিষ্টান জাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে এবং অন্যান্য জাতিকে পরাভূত করবে, হুদয়গুলো হতে ধর্মের ভালোবাসা উবে যাবে এবং (অধর্মের) বিষাক্ত বায়ু প্রবাহের ফলে ইসলাম ধর্ম এক ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন হুমকির সম্মুখীন হবে। তখন বিভিন্ন সংকট দেখা দিবে, দুঃখদুর্দশা বৃদ্ধি পাবে, মুসলমানদের অন্তর থেকে খোদাভীতি হ্রাস পেতে থাকবে। একজন মানুষের জন্য মুসলমানদের জামা'তের নাম নেওয়া থেকে একা বসবাস করা এবং বকরীর দুধে তুষ্ট থাকাই শ্রেয় হবে। তিনি (সা.) আরো বলেছেন, এ অবস্থা দেখলে তুমি সকল ফেরকা বা দলের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে এবং আমৃত্যু কোনো গাছের শিকড় কামড়ে পড়ে থাকবে। আর এ প্রসঙ্গেই তিনি (সা.) প্রতিশ্রুত মসীহর আগমন-সংবাদ দিয়ে বলেছেন, তার হাতেই খ্রিষ্টধর্মের যবনিকাপাত ঘটবে। তিনি (সা.) আরো বলেছেন, তিনি ক্রুশভঙ্গ (তথা ক্রুশীয় মতবাদের খণ্ডন) করবেন আর তিনি (সা.) একথা বলেন নি যে, সেই প্রতিশ্রুত মসীহ তাদের রাজত্বের অবসান ঘটাবেন। এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, প্রতিশ্রুত মসীহর রাজত্ব হবে আধ্যাত্মিক আর জাগতিক রাজত্বের সাথে তাঁর কোনো সংশ্লিষ্টতা থাকবে না। বরং তিনি স্বীয় আধ্যাত্মিক আশীসের বলে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধ করবেন এবং নিজ মুজিয়া (তথা অলৌকিক নিদর্শনের) অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন; এমনকি ক্রুশীয় মতবাদের ঔজ্জ্বল্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে ধূলায় মিশিয়ে দেবেন আর খ্রিষ্টধর্মের কল্যাণশূন্য ও অশুভ ধর্মবিশ্বাসের পর্দা ফাঁস করে দেবেন, কেননা তাঁর জ্যোতি একটি তরবারির ন্যায় চমকাবে এবং বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় কুফরীর অন্ধকারের ওপর আঘাত হানবে, ফলে সত্যান্বেষীরা বুঝে যাবে যে, সেই জীবন্ত খোদা ইসলামের সাথেই রয়েছেন। বিভিন্ন হাদীসে এসব ভবিষ্যদ্বাণী একটি নদীর মতো বহমান আর সেগুলোর মাঝে এমন সুগভীর আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান যে, একটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে অন্যটিও নিশ্চিতরূপে মিথ্যা সাব্যস্ত হয় এবং একটিকে মেনে নিলে অন্যটিকেও মেনে নিতে হয়। অতএব একজন বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া অন্য কেউ কি এমন ধারাবাহিক,

সুবিন্যস্ত, সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে পারে? একজন বিজ্ঞ মানুষ কি অলৌকিক বিষয়াদি-সংবলিত এসব হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এক সেকেন্ডের জন্যও এরূপ মতামত ব্যক্ত করতে পারে যে, এগুলো মানুষের বানানো কথা? প্রকৃত কথা হলো, এমন সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল ও সুমহান বিষয়কে অস্বীকার করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, কেননা সেগুলো অস্বীকার করলে এক মহাবিপর্ষয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং একটি জগৎকে পরিবর্তন করতে হয়।

এছাড়াও এসব ভবিষ্যদ্বাণীতে তার সত্যতার একটি সুমহান নিদর্শন হলো, এতে জাগতিক যে-সব অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ ছিল বাহ্যত তা অসম্ভব হলেও পূর্ণ হয়েছে, কেননা ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়াতেই অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিপদাবলি মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। এমনকি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্ম এবং ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজত্বের অবসানই ঘটে গেল আর এমন সব বিপদাপদ মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাগতিক জীবনে আপতিত হলো যেন তাদের জগৎই বদলে গেল। এসব বিপদাপদকে দৃষ্টিতে রেখে আমরা যখন সেসব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, যেগুলো ইমাম বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য ইমাম আজ থেকে প্রায় এগারো শত বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছেন আর সে যুগে এগুলো রচনা করেছেন যখন ইসলামের সূর্য ছিল মধ্যগগনে এবং এর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য দেখে ইউসুফেরও ঈর্ষা হতো আর জাগতিক জৌলুস মহান আলেকজেন্ডারকেও লজ্জিত করত। তাই আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গিন ও পবিত্র ওহী, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ এবং পবিত্রকরণ শক্তির কথা মনে হলে আমাদের ঈমানী ভাবাবেগ উদ্দীপ্ত হয় আর বাঁধ ভাঙা কান্না পায়। সুবহানাল্লাহ! তিনি কতো মহান নূর ছিলেন! যাঁর কাছে আজ থেকে তেরোশত বছর পূর্বেই তেরোশত বছর পরের অবস্থা প্রকাশ করে অবগত করা হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর উম্মত সূচনাতে কীভাবে বিকশিত হবে এবং অলৌকিকভাবে তারা উন্নতির সোপান অতিক্রম করবে আর আখেরী যামানায় কীভাবে আবার তাদের অধঃপতন ঘটবে এবং খ্রিষ্টান জাতি কীভাবে কয়েক শতকেই সমগ্র বিশ্বে জয় লাভ করবে (তা তাঁকে জানানো হয়েছে)। এখানে স্মরণ রাখতে হবে, প্রতিশ্রুত মসীহ-সংক্রান্ত বর্ণনায় এ যুগ সম্পর্কেই মহানবী (সা.) لَيُتْرَكُ الْإِلَاصَ فَلَا يُنْفَعُ عَلَيْهِ (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের বর্তমান সংস্করণে এ শব্দাবলিই বিদ্যমান, অবশ্য সহীহ মুসলিম শরীফে

وَلْيُشْرِكْ শব্দের পরিবর্তে وَلْيُشْرِكْ শব্দ বিদ্যমান। -প্রকাশক) সংবাদও দিয়েছেন, অর্থাৎ ‘প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনের যুগে উষ্ট্রীর বাহন পরিত্যক্ত হবে, এতে আরোহণ করে কেউ যাত্রা করবে না’- যা সহীহ মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে- মূলত এতে রেলগাড়ির প্রতি ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ এটি আবিষ্কৃত হবার পর উটের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। উটের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, আরবের বাহনগুলোর মধ্যে উটই সর্ববৃহৎ বাহন যার ওপর তারা তাদের ছোটোখাটো ঘরের সমস্ত জিনিস নেবার পর তাতে বসতেও পারত আর বৃহৎ বিষয়ের উল্লেখ করলে ছোটোখাটো বিষয়গুলো এতে এমনিতেই এসে যায়। অতএব একথা বলার মূল উদ্দেশ্য ছিল, সে যুগে এমন বাহন আবিষ্কৃত হবে যা উটকেও হার মানাবে। যেভাবে আপনারা দেখছেন, রেলগাড়ি আবিষ্কৃত হবার পর এখন প্রায় সেসব কাজই রেলগাড়ি করছে যা এক সময় উট করত। অতএব এরচেয়ে স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভবিষ্যদ্বাণী আর কী হতে পারে? অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনও এ যুগ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা’লা বলেছেন, وَإِذَا الْبُشْرَىٰ غَطَّتْ (আত-তাকভীর: ৫) অর্থাৎ ‘আখেরী যামানাহলো সেই যুগ যখন উট পরিত্যক্ত হবে।’- এতেও রেলগাড়ির প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। উপরোক্ত হাদীস এবং এই আয়াতটি একই সংবাদ দিচ্ছে। হাদীসে যেহেতু প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, তাই এ থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করতে হবে যে, এ আয়াতটিও প্রতিশ্রুত মসীহর যুগের অবস্থাই বর্ণনা করছে এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রতিশ্রুত মসীহর দিকেই ইঙ্গিত করছে। দেদীপ্যমান সূর্যালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট আয়াত বিদ্যমান থাকার পরও মানুষ এসব ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে! এখন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ ভেবে দেখুন, যে-সব ভবিষ্যদ্বাণীতে অন্তর্নিহিত অদৃশ্য বিষয়গুলি পূর্ণ হতে মানুষ স্বয়ং দেখেছে, সেগুলো সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কী হতে পারে?

আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, হাদীসের আলোকে প্রতিশ্রুত মসীহ-সংক্রান্ত যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী আমি লিপিবদ্ধ করেছি সেগুলো এমন মানুষের আশ্বস্ত হবার জন্য যথেষ্ট যে সত্য জানার পর অন্যায়ভাবে বিরোধিতা করতে চায় না। এখানে আমি হাদীসের শব্দগুলো ছবছ উল্লেখ করি নি এবং সবগুলো হাদীসের সারাংশও লিপিবদ্ধ করি নি, কেননা এসব হাদীস মানুষের কাছে এত প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত যে, গ্রামের ছোটোছোটো ছাত্ররাও এগুলো জানে। এ বিষয়ে

যত হাদীস রয়েছে, সেগুলোর সবই যদি আমি সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকায় উল্লেখ করতাম তাহলে হয়ত দশ খণ্ডে লিখেও শেষ করতে পারতাম না। তবে আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তারা যেন অবশ্যই সিহাহ সিত্তার মূল গ্রন্থগুলো অথবা এর অনুবাদ মনোযোগসহকারে পড়ে দেখেন, যাতে তারা জানতে পারেন, এ ধরনের হাদীসগুলো কত অধিক সংখ্যায় এবং কতটা জোরালো বক্তব্যসহ বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন তা হলো, পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কে কোনো কিছুর উল্লেখ আছে কিনা? অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ যেভাবে এ প্রশ্নের সমাধান দিয়েছে তা হলো, পবিত্র কুরআনে অবশ্যই এর উল্লেখ রয়েছে। আর এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, এ উম্মতের শেষ যুগ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে যে ব্যক্তি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবে সে যদি বুদ্ধিমান এবং সচেতন হয়ে থাকে তাহলে তাঁর একথা মানা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না যে, পবিত্র কুরআনে সুনিশ্চিতভাবে এমন একজন মুসলেহ বা সংস্কারকের আগমন বার্তা রয়েছে যার নাম ভিন্ন কিছু না হয়ে অন্য কথায় মসীহ মওউদ হওয়া উচিত। এ সংবাদটি অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতগুলো একনজরে দেখে নেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ—

وَالَّتِي أَحْصَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ○ (إِنْ هَذِهِ أَهْلَكُمُ أُمَّةٌ وَاحِدَةً ○ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ○ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ○)
(আল-আম্বিয়া: ৯২-৯৪)

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ○ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارَ الَّذِينَ كَفَرُوا ○ يُوَلِّتُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ○
(আল-আম্বিয়া: ৯৭-৯৮)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা সেই মহিলাকে হিদায়াত দিয়েছেন, যে পরপুরুষ

নোট: হিজকেল, বাব: ৩৮ ও ৩৯, আয়াত: ৫ ও ৬; রওয়াতুস সাফা বায়ানু আকলীম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড এবং তফসীর মাআলেম তথা তফসীর মা'আরিফুল কুরআন থেকে তথ্যগুলো পাওয়া যাবে।

হতে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছে। অতএব আল্লাহ্ তার মাঝে স্বীয় রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং তাকে ও তার পুত্রকে পৃথিবীর জন্য একটি নিদর্শনে পরিণত করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমাদের এ উম্মত একই উম্মত এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক-প্রভু। কাজেই, তোমরা শুধু আমারই ইবাদত করো। কিন্তু তারা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং নিজেদের (ধর্মীয়) বিষয়কে টুকরো টুকরো করে দিল আর পরস্পর মতবিরোধ করল। অবশেষে প্রত্যেকেই আমাদের দিকে ফিরে আসবে। আর ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত সবগুলো ফিরকা এ অবস্থাতেই থাকবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ছুটে আসবে। এছাড়া তোমরা যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে পৃথিবীতে বিজয়ীর বেশে দেখতে পাবে তখন বুঝে নিও, প্রতিশ্রুতি সত্য এবং সত্য ধর্ম বিস্তার লাভের সময় সন্নিহিত আর সেই প্রতিশ্রুতিটি হলো,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

[অর্থাৎ তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সকল ধর্মের ওপর বিজয় দান করেন। (আস-সাফ: ১০)– অনুবাদ] অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই প্রতিশ্রুতিটি পূর্ণ হবার সময় কাফেরদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে এবং বলবে, হায় আমাদের পরিতাপ! এ বিষয়ে আমরা উদাসীন ছিলাম; বরং আমরা তো অত্যাচারী ছিলাম। অর্থাৎ সত্য খুব জোরালোভাবে প্রকাশিত হবে আর কাফেররা বুঝে যাবে যে, ‘আমরা ভ্রান্তিতে রয়েছি’। এসব আয়াতের সারকথা হলো, আখেরী যামানায় পৃথিবীতে অনেক ধর্মের বিস্তার ঘটবে এবং বহু ফিরকা হবে। আর খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী দুটি জাতির উদ্ভব ঘটবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তারা শীর্ষস্থান অধিকার করবে। তোমরা যখন দেখবে, খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিষ্টিয় রাজত্ব বিশ্বময় বিস্তার লাভ করেছে তখন জেনে রাখো, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার সময় সন্নিহিত। অন্য এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝ وَتَرْكَنَّا بَعْضُهُمْ
يَوْمَئِذٍ يَبْغُؤُا فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَعَلْنَاهُمْ جُوعًا ۝

(আল-কাহাফ: ৯৯-১০০)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার সময় নিকটবর্তী হলে তিনি ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রতিবন্ধক দেয়াল ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবেন আর আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি ধ্রুবসত্য। আর সেদিন, অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজের শাসনামলে আমরা বিভিন্ন ফিরকাকে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করার অবকাশ দেবো। অর্থাৎ প্রত্যেক ফিরকা তাদের নিজ নিজ ধর্মমত ও ধর্মকে অন্যদের ওপর বিজয়ী করতে চাইবে। একটি ঢেউ যখন কোনো জিনিসের ওপর আছড়ে পড়ে তখন তা সেটিকে যেভাবে চাপা দিতে চায়, ঠিক একইভাবে দমনের উদ্দেশ্যে তারা ঢেউয়ের ন্যায় একে অন্যের ওপর আছড়ে পড়বে আর কোনো পক্ষই দুর্বলতা দেখাবে না। প্রত্যেক ফিরকা তাদের ধর্মমতকে উর্ধ্বে দেখানোর চেষ্টা করবে। তারা লড়াইয়ে মত্ত থাকবে, এমন সময় আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে। তখন আমরা সবগুলো ফিরকাকে একই ধর্মে একত্রিত করে দেবো।* এখানে শিঙায় ফুঁ দেবার অর্থ হলো, তখন আল্লাহর রীতি অনুযায়ী আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে ঐশীসমর্থনপুষ্ট একজন সংস্কারক জন্ম নেবেন। তাঁর হৃদয়কে আধ্যাত্মিক জীবন দিয়ে সঞ্জীবিত করা হবে এবং অন্যদের মাঝে প্রাণ সঞ্চারিত হবে। স্মরণ রেখো! 'সূর' শব্দটি সর্বদা এক মহাপরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে, কেননা আল্লাহ তা'লা যখন তাঁর সৃষ্টিকে এক রূপ থেকে অন্য রূপ দান করেন তখন এ রূপান্তর বা বিবর্তনের সময়কে **نفخ صور** বা 'শিঙার ফুঁ' নামে অভিহিত করা হয়। দিব্যদর্শীদের কাছে দিব্যদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই

* টীকা: যেহেতু এ দুটি আয়াতের পর দোযখের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং বাহ্যিক প্রেক্ষাপটও দাবি করে, তাই এ ঘটনাটি পরকাল সম্পর্কিত হওয়া উচিত— এসব আয়াত থেকে কোনো অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেন এমনটি মনে না করে। কেননা স্মরণ রাখতে হবে যে, এটি পবিত্র কুরআনের একটি সাধারণ বাগ্‌ধারা। পবিত্র এই কিতাবে এর শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে একটি জাগতিক ঘটনার সাথে পরকালের ঘটনা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। স্বকীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের প্রতিটি অংশ অন্য অংশের সাথে পার্থক্য রাখে, পুরো কুরআন শরীফে এ রীতির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কুরআনের 'শাকুল কামার' তথা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার মুজিযার প্রতিই লক্ষ্য করুন, এটি একটি নিদর্শন ছিল, কিন্তু এর সাথে কিয়ামতের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। যে কারণে কোনো কোনো অজ্ঞলোক এসব পদ্ধতি উপেক্ষা করে বলে বসে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ঘটনাটি বাস্তবে ঘটে নি, বরং কিয়ামতের দিন ঘটবে।

‘সূর’ বা শিঙার একটি দৈহিক অস্তিত্বও অনুভূত হয়। এসব বিস্ময় সেই জগতের অংশ যে জগতের রহস্য জগদ্বিমুখী মানুষ ছাড়া পৃথিবীর আর কারো কাছে প্রকাশিত হয় না। সর্বোপরি উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, শেষ যুগে খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিষ্টীয় রাজত্ব ভূপৃষ্ঠে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে, বিভিন্ন জাতির মাঝে ভীষণভাবে ধর্মীয় মতভেদ দেখা দেবে। এক জাতি অন্য জাতিকে দমন করতে চাইবে আর এমন যুগেই শিঙায় ফুঁ দিয়ে সবগুলো জাতিকে ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে সমবেত করা হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা’লার রীতি অনুযায়ী ঐশী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একজন ঐশী সংস্কারক আসবেন। মূলত এই সংস্কারকের নামই মসীহ মওউদ হবে। যেহেতু খ্রিষ্টানদের মাধ্যমে ফিতনা-ফ্যাসাদের ভিত্তি রচিত হবে এবং তাদের ক্রুশের মর্যাদা ধূলিসাৎ করা হবে আল্লাহ তা’লার একটি বড়ো লক্ষ্য, তাই সম্বোধিত এই খ্রিষ্টান জাতি করণার পাত্র হওয়ায় তাদেরকে তবলীগের জন্য যে ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয়েছে তাঁর নাম মসীহ ও ঈসা রাখা হয়েছে। এতে প্রজ্ঞার অপর বিষয়টি হলো, খ্রিষ্টানরা যেহেতু হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদার আসনে বসিয়েছে এবং নিজেদের বিভিন্ন মিথ্যাচার তাঁর প্রতি আরোপ করেছে আর বিশ্বব্যাপী শত-সহস্র প্রতারণার জাল বিছিয়েছে, এছাড়া হযরত ঈসাকে অলীক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে বিধায় জীবন্ত ও অনন্য অদ্বিতীয় খোদার আত্মাভিমান এই উম্মতের মধ্য থেকেই তাঁর এক বান্দাকে ঈসা ইবনে মরিয়ম নামে প্রেরণ করতে এবং ঐশীনির্দেশন প্রদর্শন করতে চাইল যাতে করে প্রমাণ হয়ে যায় যে, বান্দাকে খোদার আসনে বসানো মূর্খতা— তিনি যাকে চান মনোনীত করেন এবং একটি মাটির ঢেলাকেও তিনি সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারেন। এখানে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে যখন কোনো সংস্কারক আবির্ভূত হন তখন তাঁর আবির্ভাবের সময় আকাশ থেকে এক নূরের বিচ্ছুরণ ঘটে। অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের সাথে এক ধরনের নূরও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং সোচ্চার হৃদয়গুলোতে তা নাযিল হয়। জগদ্বাসী তখন যোগ্যতার নিরিখে স্বপ্রণোদিত হয়ে পুণ্য ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হয় এবং প্রতিটি হৃদয় গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রতি মনোযোগী হয় আর অজানা কারণে সোচ্চার লোকদের মাঝে সত্যান্বেষণের জন্য এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মোটকথা, এমন এক বাতাস বইতে আরম্ভ করে যা সোচ্চার মানুষগুলোকে পরকালের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং সুপ্ত শক্তিসামর্থ্যকে

জাগ্রত করে। মনে হয়, যুগ যেন এক মহাবিপ্লবের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অতএব এসব লক্ষণ এ সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীতে সেই সংস্কারকের জন্ম হয়ে গেছে। আগমনকারী সংস্কারক যতটা মহান হন, সোচ্চার হৃদয়গুলোতে অদৃশ্য এসব আন্দোলনও ততটা শক্তি নিয়ে আপন কর্ম সম্পাদন করে। প্রতিটি সদাত্মা জেগে ওঠে, কিন্তু কে তাঁকে জাগিয়েছে তা সে জানে না। সঠিক প্রকৃতির প্রতিটি মানুষ নিজের মাঝে এক পরিবর্তন লক্ষ করে, কিন্তু সে জানে না কীভাবে এ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মোটকথা, হৃদয়গুলোতে একপ্রকার আলোড়ন সৃষ্টি হয়, কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা মনে করে, এ আলোড়ন আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। অথচ এক রসূল বা মুজাদ্দিদের সাথে এই নূর প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যেমন- মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ ○ لَيْلَةُ الْقَدَرِ خَبِيرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ○ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○

(আল-কাদর: ২-৬)

অর্থাৎ আমরা এ কিতাব (কুরআন) ও এ নবীকে কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। তুমি কি জানো! লাইলাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ রাতে ফেরেশতারা ও রুহুল কুদ্দুস তাদের প্রতিপালক-প্রভুর নির্দেশে অবতীর্ণ হয়। আর তা সব বিষয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার সময় হয়ে থাকে এবং এ অবস্থাতেই প্রভাত প্রস্ফুটিত হয়। যদিও বর্তমানে মুসলমানদের প্রচলিত বিশ্বাস হলো, লাইলাতুল কদর একটি বরকতময় রজনীর নাম, কিন্তু আল্লাহ তা'লা আমাদের সাধারণভাবে স্বীকৃত অর্থ হতে ভিন্ন যে সত্য অবগত করেছেন তা হলো, সে যুগকেও লাইলাতুল কদর বলা হয় যখন অন্ধকাররাশি জগৎ জুড়ে ছেয়ে যায় এবং সর্বত্র শুধু আঁধারের ঘনঘটা বিরাজ করে। তখন স্বাভাবিকভাবেই সেই অন্ধকার আকাশ থেকে কোনো নূরের অবতরণ দাবি করে। অতএব আল্লাহ তা'লা তখন তাঁর জ্যোতির্মণ্ডিত ফেরেশতা ও রুহুল কুদ্দুসকে ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ করেন। ফেরেশতাদের মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ পন্থায়ই তারা অবতীর্ণ হয়। তখন সেই মুজাদ্দিদ ও মুসলেহ বা সংস্কারকের সাথে রুহুল কুদ্দুস সম্পর্ক স্থাপন করে, যিনি মনোনয়ন ও নির্বাচনের ঐশী পোশাকে সজ্জিত হয়ে সত্য প্রচারে আদিষ্ট হন। অপরদিকে যারা পুণ্যবান,

বিবেকবান ও সোচ্চার মানুষ তাদের সবার সাথে ফেরেশতারা সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তাদেরকে পুণ্যের প্রতি আকৃষ্ট করে আর পুণ্যকর্ম করার সামর্থ্য তাদের মাঝে সৃষ্টি করে ও তাদের সামনে সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দেয়। পৃথিবীতে তখন সুখশান্তি ও সৌভাগ্যের পথ প্রশস্ত হয় এবং ধর্মের জন্য নির্ধারিত উৎকর্ষ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থাই চলমান থাকে।

এখন দেখা উচিত, আল্লাহ তা'লা এই বরকতময় সূরাতে পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে যখন কোনো সংস্কারক আবির্ভূত হন, তখন অবশ্যই মানবহৃদয়ে আলোড়নসৃষ্টিকারী ফেরেশতারাও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। তখন তাদের অবতরণের ফলে (মানুষের) হৃদয়ে পুণ্যকর্ম ও সৎপথের প্রতি এক আলোড়ন ও আন্দোলন সৃষ্টি হয়। অতএব কোনো মুসলেহ বা সংস্কারকের আবির্ভাব ছাড়াই অবলীলায় এই আলোড়ন ও আন্দোলন সৃষ্টি হয়— এমনটি মনে করা মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী ও তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিপন্থি। এ ধরনের কথা কেবল সেসব মানুষের মুখেই শোভা পায় যারা ঐশী রহস্যাবলি সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ আর তারা শুধু তাদের ভিত্তিহীন ধ্যাণধারণারই অনুসরণ করে। বরং এটি তো ঐশী সংস্কারক আবির্ভাবের বিশেষ নিদর্শন যা উজ্জ্বল সূর্যালোকের ন্যায় প্রকাশিত হয়। তবে হ্যাঁ, এ তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। একজন বস্তুবাদী মানুষের ঝাপসা দৃষ্টি এই নূরের সন্ধান করতে পারে না, কেননা তার দৃষ্টিতে ধর্মীয় সত্যতা একটি হাস্যকর বিষয় এবং ঐশী তত্ত্বজ্ঞান তার মতে মূর্থতা ছাড়া কিছু নয়।

অন্য যে-সব আয়াতে শেষ যুগের নিদর্শনাবলি বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ সেসব আয়াত যাতে প্রথমে জাগতিক অন্ধকার ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং পরে ঐশী জ্যোতি অবতীর্ণ হওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, সে আয়াতগুলো হলো—

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝

অর্থাৎ শেষ যুগে এমন একটি সময় আসবে যখন পৃথিবীকে এক ভয়ানক কম্পনের মাধ্যমে যতটা সম্ভব প্রকম্পিত করা হবে। অর্থাৎ বিশ্ববাসীর মাঝে

এক মহাপরিবর্তন সাধিত হবে। প্রবৃত্তি ও জগৎপূজার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবে। এরপর বলেছেন, ভূমি তার সমস্ত ভাগ্য উজাড় করে দেবে। অর্থাৎ মানবপ্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত পার্থিব জ্ঞান, প্রতারণা, চাতুর্য এবং জাগতিক উন্নতির যা কিছু নিহিত আছে, এর সবই প্রকাশ পেয়ে যাবে। এমনকি মানুষ যে ভূমিতে বসাবাস করে সেই ভূমিও এর সমস্ত বিশেষত্ব প্রকাশ করে দিবে। পদার্থবিদ্যা ও কৃষি বিজ্ঞানের মাধ্যমে এর অনেক গুণাগুণ উদ্ঘাটিত হবে, বিভিন্ন খনি আবিষ্কৃত হবে আর ব্যাপকভাবে চাষাবাদের প্রচলন ঘটবে। মোটকথা, ভূমি উর্বর হয়ে উঠবে। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও মেশিন আবিষ্কৃত হবে; এমনকি মানুষ বলাবলি করবে, ব্যাপার কী? এত এত নিত্যনূতন জ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্প কীভাবে উদ্ভাবিত হচ্ছে? তখন ভূমি, অর্থাৎ মানব হৃদয় বাস্তব ও ব্যবহারিক অবস্থার মাধ্যমে নিজ কাহিনি বর্ণনা করবে। এসব নতুন বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ আমাদের পক্ষ থেকে ঘটছে না; বরং এগুলো তো আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে এক ধরনের ওহী, কেননা মানুষ নিজ চেষ্টাপ্রচেষ্টায় এমন সব বিস্ময়কর জ্ঞানের উদ্ভাবন করবে এমনটি সম্ভব নয়।

স্মরণ রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনের এসব আয়াতের সাথে পরকাল সম্পর্কিত আরো কিছু আয়াত যুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো আসলে পূর্বে উল্লিখিত সুন্নাতুল্লাহ বা ঐশীরীতি অনুসারেই যুক্ত করা হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমরা যা বর্ণনা করেছি তা-ই এসব আয়াতের প্রকৃত ও মূল অর্থ। এর অনুকূলে অত্যন্ত জোরালো ও চূড়ান্ত যৌক্তিক বিষয়টি হলো, এসব আয়াতের আক্ষরিক অর্থ করা হলে একটি চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। অর্থাৎ আমরা যদি এভাবে অর্থ করি যে, ভূপৃষ্ঠে জনবসতি থাকা অবস্থায়ই পৃথিবীতে এমন ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হবে যার ফলে পৃথিবীর উপরের স্তর নীচে আর নীচের স্তর উপরে উঠে আসবে, তাহলে এটি হবে একেবারেই অসম্ভব ও অকল্পনীয় বিষয়াদির অন্তর্গত। উল্লিখিত আয়াতে সুস্পষ্টরূপে লেখা রয়েছে, মানুষ বলবে পৃথিবীর কী হয়েছে? অত্যন্ত ভয়ংকর ভূমিকম্পের ফলে পৃথিবী ওলটপালট হয়ে যাবে— একথা যদি বাস্তবেই সত্যি হয়, তবে পৃথিবীকে প্রশ্ন করার জন্য মানুষ কোথায় থাকবে? সে যে এর পূর্বেই ভূমিকম্পের কারণে ভূগর্ভে হারিয়ে যাবে। ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানকে তো কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। অতএব এমন ভিত্তিহীন সমসাময়িক সত্যের পরিপন্থি অর্থ করার মানে হলো, ইসলামকে হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করা এবং বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি

করার সুযোগ করে দেওয়া। অতএব এফুনি আমরা যে অর্থ করেছি সেটিই হলো, প্রকৃত ও সঠিক অর্থ। একথা সবারই জানা যে, আমাদের যুগের এসব পরিবর্তন, ফিতনা-ফ্যাসাদ ও ভূমিকম্প খ্রিষ্টান জাতির মাধ্যমেই উদ্ভূত হয়েছে আর এর দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে ইতঃপূর্বে কখনোই দৃষ্টিগোচর হয় নি। অতএব এটি এ বিষয়ের আরেকটি প্রমাণ যে, এ জাতিই সেই শেষ জাতি যাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার বিস্তার ঘটানির্ধারিত ছিল এবং যারা পৃথিবীতে নানা ধরনের ভেলকিবাজি দেখিয়েছে। যেমনটি লেখা রয়েছে যে, দাজ্জাল নবুওয়তের দাবি করবে এবং ঈশ্বরত্বের দাবিও এদের দ্বারাই উত্থাপিত হবে। এ জাতির মাধ্যমে সে দুটি বিষয়ই প্রকাশ পেয়ে গেছে। যে পন্থায় তারা নবুওয়তের দাবি করেছে তা হলো, এ জাতির পাদ্রীররা নবীদের কীভাবে চরম ঔদ্ধত্যের সাথে হস্তক্ষেপ করেছে আর এমন ধৃষ্টতার সাথে হস্তক্ষেপ করেছে যেন তারা নিজেরাই নবী। নিজেদের ইচ্ছামতো তারা তাঁদের বিভিন্ন উদ্ধৃতি পরিবর্তন করেছে, নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা লিখেছে এবং সর্বত্র ঔদ্ধত্যের সাথে প্রতারণাপূর্ণ হস্তক্ষেপকে খোদার কথা হিসেবে চালানোর চেষ্টা করেছে। যা কিতাবে বিদ্যমান ছিল তা গোপন করেছে, পক্ষান্তরে যার অস্তিত্বই ছিল না তা যোগ করেছে এবং ধৃষ্টতার সাথে এমন প্রক্ষেপিত অর্থ করেছে যেন তাদের ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছে আর তারা নবী! উদাহরণস্বরূপ, সর্বদাই দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধর্মীয় বিতর্কের সময় তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন সব অনর্থক ও সত্য বিবর্জিত উত্তর দেয় যে, মনে হয় তারা এক নতুন ইনজীল রচনা করছে। অনুরূপভাবে এদের রচনাসমূহও কোনো নতুন ঈসা ও নতুন ইনজীলের দিকেই পরিচালিত করছে। এছাড়া তারা মিথ্যা বলার সময় একটুও ভয় পায় না, চালাকি করে নিজেদের এই মিথ্যা দাবির স্বপক্ষে কোটি কোটি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছে। ভাবটা এমন, যেন তারা হযরত ঈসাকে খোদার আসনে বসে থাকতে দেখে এসেছে। অপরদিকে যেভাবে তারা ঈশ্বরত্বের দাবি করেছে তা হলো, আল্লাহর কাজে তারা সীমিতরিক্ত হস্তক্ষেপ করেছে এবং তারা চায় যে পৃথিবী ও আকাশের কোনো গুপ্তরহস্য যেন এমন না থাকে যার গভীরে তারা অবগাহন না করবে। এছাড়া তাদের অভিলাষ হলো, আল্লাহ তা'লার সমস্ত কাজ নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়া আর এভাবে যেন ঐশী কলকাঠির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ সম্ভব হলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তও যেন তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, বৃষ্টি হওয়া বা না হবার বিষয়টি যেন তাদের হাতের

কারসাজির ওপর নির্ভর করে এবং তাদের কাছে যেন অসম্ভব বলে কিছুই না থাকে। ঐশীকর্ম ও আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ক্ষমতায় তাদের হস্তক্ষেপ করতে চাওয়া এবং 'যদি আমরা কোনোভাবে তাঁর জায়গাটি কুক্ষিগত করতে পারতাম'- এ বাসনা করাই তো ঈশ্বরত্বের দাবি- ঈশ্বরত্বের দাবি এছাড়া আর কাকে বলে? যে-সব লোক প্রতিশ্রুত মসীহ ও দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীস নিয়ে সমালোচনা করে তাদেরকে এক্ষেত্রে ভাবা উচিত যে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী যদি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে না হয়ে মানুষের কারসাজি হতো তাহলে এমন সুস্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে এসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না। কেউ কি কখনো একথাও ভেবেছিল যে, কোনো এক যুগে এই খ্রিষ্টান জাতি মানুষকে খোদা বানানোর উদ্দেশ্যে এত অপচেষ্টা ও জালিয়াতির আশ্রয় নেবে এবং দার্শনিক গবেষণায় আল্লাহ্ তা'লার জন্য স্বতন্ত্র কোনো স্থানই বাকি রাখবে না? লক্ষ করুন! (হাদীসে) লেখা আছে, দাজ্জালের গাধার দুই কানের দূরত্ব হবে ৭০ গজ আর এটি রেলগাড়ির সাথে সবচেয়ে নিখুঁতভাবে মিলে যায়। যেভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আছে, সেযুগে বাহন হিসেবে উট পরিত্যক্ত হবে- এখন আমরা এমনটিই দেখছি, অর্থাৎ রেলগাড়ি অন্য সব বাহনকে গুরুত্বহীন করে তুলেছে। এখন খুব কমই এগুলোর প্রয়োজন পড়ে, কিছু দিন পর হয়ত এতটুকু প্রয়োজনও আর অবশিষ্ট থাকবে না। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, প্রকৃতপক্ষে এ জাতির আলেম ও জ্ঞানীজনরা ধর্ম সম্বন্ধে সেসব নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে, যার দৃষ্টান্ত হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত দেখা যায় না। অতএব নিঃসন্দেহে তারা নবুওয়ত এবং ঈশ্বরত্বের মাঝে হস্তক্ষেপ করেছে। এসব হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই এগুলো যে সঠিক হাদীস সে কথার এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কী হতে পারে? পবিত্র কুরআনের اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يَخْلُفُ [অর্থাৎ পৃথিবীকে যখন এর (প্রচণ্ড) কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে। (আয-যিলযাল: ২) -অনুবাদক] আয়াতে আসলে দাজ্জালী যুগের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে- যার মাথায় সামান্যতম বুদ্ধি আছে সেও এ বিষয়টি বুঝতে পারবে। এছাড়া এ আয়াতটি সুস্পষ্টরূপে বলছে যে, এ জাতি জাগতিক জ্ঞানে কত বেশি উন্নতি করবে।

এ যুগের লক্ষণাবলির মধ্যে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিষয়াদির উদ্ভব যখন ভূমি হতে ঘটবে তখন কতিপয় আবিষ্কার ও শিল্পকারখানার কথা (পবিত্র কুরআন) উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করেছে আর তা হলো,

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَالْقَتُّ مَا فِيهَا وَتَحَكَّتْ

অর্থ: ভূমিকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে (আল-ইনশিকাক: ৪-৫), অর্থাৎ ভূমি পরিষ্কার করা হবে, জনবসতি বৃদ্ধি পাবে, ভূগর্ভে যা কিছু সঞ্চিত আছে পৃথিবী তা বের করে দিয়ে খালি হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভূমির সমস্ত সক্ষমতা বিকশিত হয়ে দৃশ্যপটে এসে যাবে, যেমনটি ইতঃপূর্বেই সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

وَإِذَا الْعُشُورُ عُظِلَّتْ

অর্থ: তখন উষ্ট্রী বেকার হবে আর এর কোনো চাহিদা ও মূল্য থাকবে না (আত-তাকভীর: ৫)। দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীকে عُشُور (ঈশার) বলে, আরবের লোকদের কাছে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী খুব প্রিয় ছিল। একথা সুস্পষ্ট যে, কিয়ামতের সাথে এ আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই, কেননা কিয়ামত এমন জায়গা নয় যেখানে উষ্ট্রী উটের সাথে মিলিত হবে আবার গর্ভবতীও হবে। বরং এটি রেলগাড়ি আবিষ্কারের প্রতি ইঙ্গিত করছে আর গর্ভবতী হবার শর্ত জুড়ে দেবার উদ্দেশ্য হলো, এটি যে একটি পার্থিব ঘটনা তার স্বপক্ষে যেন শক্তিশালী যুক্তি সন্নিবেশিত থাকে এবং পরকালের ধারণা যেন ঘুণাক্ষরেও মাথায় না আসে।

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

অর্থ: আর যখন ব্যাপকভাবে পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশ করে বিস্তৃত করা হবে। (আত-তাকভীর: ১১) অর্থাৎ বইপুস্তক প্রকাশ ও প্রচারের উপকরণ সৃষ্টি হবে। এটি ছাপাখানা ও ডাকঘরের প্রতি ইঙ্গিত করছে; অর্থাৎ আখেরী যামানাত তথা শেষ যুগে এর ব্যাপক প্রচলন হবে।

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

অর্থাৎ আর যখন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মানুষকে একত্রিত করা হবে (আত-তাকভীর: ৮)। বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি এটি ইঙ্গিত করছে। এর অর্থ, শেষ যুগে রাস্তাঘাট তৈরি এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগের সুব্যবস্থার কল্যাণে মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। এক জাতি অন্য জাতির সাথে সাক্ষাৎ করবে। আত্মীয়তা এবং ব্যবসায়ী সূত্রে দূরদূরান্তে মৈত্রী গড়ে উঠবে। দূরবর্তী দেশগুলোর মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে।

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

অর্থ: আর যখন সাধারণ মানুষের সাথে বন্য মানুষগুলোকে একত্রিত করা হবে (আত-তাকভীর: ৬)। অর্থাৎ অসভ্য বা বন্য জাতিগুলো যখন সভ্যতার প্রতি মনোযোগী হবে এবং তাদের মাঝে মানবতা ও ভালোমন্দের পার্থক্য করার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে। নিকৃষ্ট লোকেরা জাগতিক সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত হবে এবং জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারের কল্যাণে অভিজাত ও হীন লোকদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না; বরং নীচ লোকেরাই প্রাধান্য পাবে। এমনকি তাদের হাতেই সম্পদের চাবিকাঠি এবং ক্ষমতার বাগডোর থাকবে। এ আয়াতের বিষয়বস্তু একটি হাদীসের বিষয়বস্তুর সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

অর্থ: আর যখন নদীগুলোকে বিদীর্ণ করা হবে (আল-ইনফিতার: ৪)। অর্থাৎ পৃথিবীতে অনেক খাল খনন করা হবে এবং ব্যাপক পরিসরে কৃষিকাজ হবে।

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ

অর্থ: পাহাড়কে যখন (বোমা মেরে) উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং এগুলোর মধ্যে দিয়ে পায়ে হাঁটার ও যানবাহন চলাচলের অথবা রেলগাড়ি চলার জন্য রাস্তা নির্মাণ করা হবে (আল-মুরসালাত: ১১)। এছাড়া সর্বজনীন অমানিশার লক্ষণাবলিও বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন,

إِذَا السَّمَاءُ كُفِّرَتْ

অর্থ: যখন সূর্যকে আবৃত করা হবে (আত-তাকভীর: ২)। অর্থাৎ অজ্ঞতা ও পাপাচারের ঘোর অমানিশা পৃথিবীতে ছেয়ে যাবে।

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ

অর্থ: আর যখন তারকারাজি নিস্প্রভ হয়ে যাবে (আত-তাকভীর: ৩)। অর্থাৎ আলেম সম্প্রদায়ের নিষ্ঠার জ্যোতি ক্রমশ ম্লান হতে থাকবে।

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ

অর্থ: আর যখন তারকারাজি ঝরে যাবে (আল-ইনফিতার: ৩)। অর্থাৎ খোদাপ্রেমী আলেমরা তিরোহিত হবেন, কেননা পৃথিবীর মাটিতে তারকা খসে

পড়ার পরও পৃথিবী মানুষে পরিপূর্ণ থাকবে তা তো সম্ভবই নয়। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাব সম্পর্কে ইনজীলেও এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। যেমন- পৃথিবীতে যখন তারা খসে পড়বে এবং চাঁদ ও সূর্যের আলো নিঃপ্রভ হতে থাকবে তখন তিনি আবির্ভূত হবেন। এসব ভবিষ্যদ্বাণীকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া এতটাই অযৌক্তিক যে, সূর্যের আলো আসলেই হ্রাস পেতে থাকবে, সারা পৃথিবীজুড়ে তারকাপাত ঘটবে, তথাপি পৃথিবীতে স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ বসবাস করবে আর এমতাবস্থায় প্রতিশ্রুত মসীহ আবির্ভূত হবেন- একথা কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনোই বলতে পারে না। আরো বলেছেন,

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

অর্থ: আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে (আল-ইনশিকাক: ২)।

একইভাবে বলেছেন,

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

[অর্থ: আকাশ যখন ফেটে যাবে। (আল-ইনফিতার: ২) -অনুবাদক] এবং ইনজীলেও অনুরূপভাবে প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব আয়াতের অর্থ এটি নয় যে, তখন আসলেই আকাশ বিদীর্ণ হবে অথবা এর কার্যক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়বে। বরং মূল উদ্দেশ্য হলো, কোনো বিদীর্ণ বস্তু যেভাবে অচল হয়ে যায়, ঠিক একইভাবে আকাশও বাতিল জিনিসের মতো হয়ে যাবে। আকাশ হতে কৃপাবারি বর্ষিত হবে না এবং পৃথিবী ঘোর অন্ধকার ও অমানিশায় ছেয়ে যাবে।

আরেক স্থানে বলেছেন,

وَإِذَا الرُّسُلُ أُوتِيتْ

অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে যখন রসূলকে আবির্ভূত করা হবে (আল-মুরসালাত: ১২)। এটি মূলত প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাবের প্রতি ইঙ্গিত করছে। একথা যথাসময়ে বলার উদ্দেশ্য হলো, তিনি সঠিক সময়ে আসবেন। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর বাণীতে ‘رُسُلُ’ (রসূল) শব্দটি এক বচনের জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং রসূল নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। এ বিষয়টি আমি কয়েকবার বর্ণনা করেছি, অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ আয়াত

বিভিন্ন অর্থের সমাহার। যেভাবে হাদীস থেকেও প্রমাণিত যে, কুরআন শরীফের একটি যাহেরী বা প্রকাশ্য দিক রয়েছে এবং একটি বাতেনী বা অভ্যন্তরীণ দিক রয়েছে। কাজেই, রসূলগণ যদি কিয়ামতের ময়দানেও সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে সমবেত হন তা-ও ঠিক আছে। কিন্তু এখানে শেষ যুগের দুরবস্থার লক্ষণাবলি বর্ণনা করার পর এটিও বলে দিয়েছেন যে, রসূলকে তখন নির্ধারিত সময়ে আবির্ভূত করা হবে। অতএব প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সুস্পষ্টরূপে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সেই ঘোর অমানিশার পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কোনো রসূলকে প্রেরণ করবেন যেন বিভিন্ন জাতির মাঝে মীমাংসা হয়। আর যেহেতু কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই অমানিশা দেখা দেবে খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে, তাই নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রত্যাশিষ্ট মহাপুরুষও তাদেরকে তবলীগ করার জন্য এবং তাদের মাঝে মীমাংসার উদ্দেশ্যে আসবেন। অতএব এই সাদৃশ্যের জন্যই তাঁর নাম ঈসা রাখা হয়েছে। কেননা তিনি খ্রিষ্টানদের জন্য সেভাবেই প্রেরিত হয়েছেন যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) তাদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন এবং إِذَا السُّعْلُ أُتْرِدَ [অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে যখন রসূলকে আনা হবে (আল-মুরসালাত: ১২) -অনুবাদক]-এ আয়াতে اِل (আলিফ ও লাম) এহুদে খারিজির [এমন আলিফ লামকে এহুদে খারেজি বলে যার অর্থ বক্তা ও সম্বোধনকারী উভয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। -অনুবাদক] ইঙ্গিত বহন করছে। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর নিজের ভাষায় যে মুজাদ্দিদকে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তিনি সেই খ্রিষ্টীয় অমানিশার যুগে প্রেরিত হবেন।

এখন পর্যন্ত আমরা পবিত্র কুরআনের যতগুলো আয়াত লিপিবদ্ধ করেছি সেগুলোর মাধ্যমে অতিউত্তমরূপে প্রতীয়মান হয়, এ ভবিষ্যদ্বাণীটি পবিত্র কুরআনে অবশ্যই রয়েছে যে, শেষ যুগে খ্রিষ্টধর্ম পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করবে। আর তারা ইসলাম ধর্মকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার পায়তারা করবে এবং তাদের জন্য যতটা সম্ভব নিজেদের ধর্মের কল্যাণ সাধনে সর্বাগ্রক চেষ্টার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি রাখবে না। তখন ইসলাম ধর্মের সাহায্যের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন এবং সেই নৈরাজ্যের যুগে দেখিয়ে দেবেন- কীভাবে তিনি তাঁর ধর্ম ও পবিত্র কালামকে রক্ষা করেন। ঐ সময় তাঁর চিরন্তন রীতি ও সুন্নত অনুযায়ী এক ঐশী জ্যোতি অবতীর্ণ হবে এবং প্রতিটি সং প্রকৃতির মানুষকে সেই জ্যোতির প্রতি আকৃষ্ট করা হবে আর এভাবে সকল

পুণ্যবান লোক একই পতাকাতলে সমবেত হবে। আল্লাহ তা'লা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, যুদ্ধবিগ্রহ ও (ধর্মীয়) তর্কবিতর্কের যুগে শিঙা বাজানো হবে এবং পুণ্যবান লোকদের তখন একই ধর্মের ছায়াতলে সমবেত করা হবে। এছাড়া আরো বলেছেন, অমানিশার যুগে রসূলদের প্রেরণ করা হবে। এখন এর চেয়ে সুস্পষ্ট বিবরণ আর কী হতে পারে যে, মহাপ্রতাপাশ্রিত আল্লাহ বলেছেন, শেষ যুগের প্রথম লক্ষণ, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাধান্য লাভ করা; অর্থাৎ রাশিয়া ও ইংরেজদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা। দ্বিতীয় লক্ষণ, বহু ফিরকার সৃষ্টি হওয়া। তৃতীয় লক্ষণ, সেসব ফিরকার পারস্পরিক বিতর্কে লিপ্ত হওয়া আর (সমুদ্র) তরঙ্গের ন্যায় একে অন্যের ওপর আছড়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ লক্ষণ, রেলগাড়ির প্রচলন। পঞ্চম লক্ষণ, পুস্তকপুস্তিকা ও পত্রপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যম (সামনে আসা) যেমন, ছাপাখানা এবং টেলিফোনের প্রচলন। ষষ্ঠ লক্ষণ, ব্যাপকভাবে খাল খনন। সপ্তম লক্ষণ, আবাদি ভূমির সম্প্রসারণ ও কৃষিকাজ বৃদ্ধি পাওয়া। অষ্টম লক্ষণ, পাহাড়গুলোকে (বোমা মেরে- অনুবাদক) উড়িয়ে দেওয়া। নবম লক্ষণ, আধুনিক সব জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধন। দশম লক্ষণ, পাপ ও অমানিশার বিস্তার এবং পৃথিবী থেকে তাকওয়া তথা খোদাভীতি, তাহরাত তথা আত্মিক পবিত্রতা ও ঈমানের জ্যোতি হারিয়ে যাওয়া। একাদশ লক্ষণ, 'দাব্বাতুল আরয' তথা মাটির কীটের আবির্ভাব, অর্থাৎ এমন বক্তার আধিক্য হওয়া যাদের মাঝে বিন্দুমাত্রও ঐশী নূর থাকবে না। তারা নিছক দুনিয়ার কীট হবে এবং কার্যত তারা দাজ্জালের সহচর হলেও মৌখিক দাবি ইসলামের অনুসারী হবার থাকবে। অর্থাৎ কার্যত তারা দাজ্জালের চেলা এবং তাদের চেহারা হবে বিকৃত। পশুর মতো চেহারা হলেও তাদের ভাষা মানুষের মতো। দ্বাদশ লক্ষণ, প্রতিশ্রুত মসীহর জন্ম নেওয়া, আল্লাহর বাণীতে যাকে রূপকভাবে **نَفْخُ صُورٍ** (শিঙায় ফুঁ দেওয়া- অনুবাদক) আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর **نَفْخُ** বা ফুঁ দেওয়া মূলত দুই ধরনের, একটি পথভ্রষ্টতার ফুঁ এবং অন্যটি হিদায়াতের ফুঁ। যেমন-

وَنُفِّخُ فِي الصُّورِ فَصَقَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِّخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُنظَرُونَ

(আয-যুমার: ৬৯)

এ আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে, [অর্থাৎ আর (যখন) শিঙায় ফুঁ

দেওয়া হবে তখন যারা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তারা (সবাই) মূর্খা যাবে। তবে আল্লাহ্ যার জন্য চাইবেন (তার কথা ভিন্ন)। এরপর এতে পুনরায় ফুঁ দেওয়া হবে। তখন অকস্মাৎ তারা (সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়) দাঁড়িয়ে পড়বে।] এ আয়াতগুলোর একাধিক অর্থ করা যায়, তাই এগুলো কিয়ামতের সাথেও সম্পর্ক রাখে আবার ইহজগতের সাথেও; যেমন-

اَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

[অর্থাৎ জেনে রাখো! পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ জীবিত করেন। (আল-হাদীদ: ১৮) -অনুবাদক]

আর যেভাবে আয়াত فَسَاءَتْ أَوْدِيَّتُهُ بِقَدَرِهَا [অর্থাৎ এর ফলে উপত্যকাগুলো নিজ নিজ ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী প্লাবিত হয়। (আর-রা'দ: ১৮) -অনুবাদক] ইহজগতের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব আয়াতের অর্থ হলো, শেষ দিনগুলোতে দুটি যুগ আসবে। একটি পথভ্রষ্টতার যুগ। এ যুগে প্রত্যেক জগৎপুজারি ও আধ্যাত্মিক মানুষ, অর্থাৎ পাপী ও পুণ্যবান মানুষের ওপর উদাসীনতা ছেয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ তা'লা যাকে রক্ষা করবেন সে ব্যতীত। দ্বিতীয়টি হলো, হেদায়াতের যুগ আর মানুষ তখন অকস্মাৎ উঠে দাঁড়াবে এবং দেখতে পাবে, অর্থাৎ উদাসীনতা দূর হয়ে যাবে আর মানুষের অন্তরে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চারিত হবে-পাপীরা ঈমান না আনলেও নিজেদের মন্দকর্মের বিষয়ে সতর্ক হয়ে যাবে।

এসব আয়াত ছাড়াও পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াত রয়েছে যা এই শেষ যুগ এবং প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাব সম্পর্কে প্রমাণ বহণ করে। কিন্তু এসব আশিসপূর্ণ অর্থের উৎসমূল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কাজেই, ভাষাভাষা চিন্তার অধিকারী মানুষ এদিকে দৃষ্টি দিতে পারে না। স্থূলবুদ্ধি এসব সূক্ষ্ম বিষয় উদ্ধার করতে পারে না। যেমন- সেসব আয়াতের মাঝে এ আয়াতটি রয়েছে-

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

(আল-মুযযাম্মিল: ১৬)

[অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি তত্ত্বাবধায়করূপে এক রসূল পাঠিয়েছি যেভাবে আমরা ফেরাউনের প্রতি এক রসূল পাঠিয়েছিলাম। -অনুবাদক।] এখন জানা কথা كَمَا (কামা) শব্দের মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমাদের নবী (সা.) মসীলে মুসা বা মুসার সদৃশ নবী।

যেভাবে তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণী অধ্যায়েও মহানবী (সা.)-কে মসীলে মূসা বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর মনে রাখতে হবে যে, সাদৃশ্যের অর্থ পরিপূর্ণ সাদৃশ্য- অপূর্ণ সাদৃশ্য নয়, কেননা আংশিক সাদৃশ্য বুঝালে এক্ষেত্রে নবী করীম (সা.)-এর জন্য কোনো বিশেষত্ব বজায় থাকে না। কেননা এমন সাদৃশ্যের অধিকারী অনেক নবী পাওয়া যাবে যাঁরা আল্লাহ্ তা'লার আদেশে তরবারিও হাতে নিয়েছেন আবার হযরত মূসার মতো যুদ্ধও করেছেন আর বিস্ময়করভাবে অনেক বিজয়ও লাভ করেছেন। তাই বলে কি তাঁরা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল সাব্যস্ত হতে পারেন? না, কখনোই না। মোটকথা, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিশেষত্ব সেই অবস্থায়-ই সাব্যস্ত হওয়া সম্ভব, যখন সাদৃশ্য বলতে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য বুঝানো হবে। পরিপূর্ণ সাদৃশ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি অংশ হলো, মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর রিসালাত বা নবুওয়তের মর্যাদায় ভূষিত করার পর সম্মান ও পুরস্কারস্বরূপ তাঁর শরীয়তে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক খেলাফতের এক সুদীর্ঘ ধারা দান করেছেন যা প্রায় চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। ইত্যবসরে মূসায়ী শরীয়তে শত শত রাজাবাদশা এবং ওহী ও এলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। সব সময় আল্লাহ্ তা'লা মূসায়ী শরীয়তের পৃষ্ঠপোষকদের এমন আশ্চর্যজনকভাবে সাহায্য করে আসছেন, যা এক বিস্ময়কর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেছেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

(আল-বাকার: ৮৮)

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافِقَةً وَرَحْمَةً

(আল-হাদীদ: ২৮)

অর্থাৎ আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে আরো অনেক রসূল এসেছে। সবার শেষে আমরা ঈসা ইবনে মরিয়মকে প্রেরণ করেছি এবং তাকে ইনজীল দিয়েছি আর তার অনুসারীদের হৃদয়ে দয়ামায়া ও ভালোবাসা সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ তারা তরবারি নয়; বরং নিজের নম্রতা, বিনয় ও চারিত্রিক

গুণাবলির মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করত। এ আয়াতে যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তা হলো, যদিও মুসায়ী শরীয়ত ছিল জালালী (প্রতাপান্বিত) শরীয়ত এবং এ শরীয়তের আদেশেই লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, এমনকি প্রায় চার লাখ দুধের শিশুকেও হত্যা করা হয়েছিল। তথাপি আল্লাহ তা'লা এই ধারার পরিসমাপ্তি দয়ামায়ার মাধ্যমে করতে চেয়েছেন এবং তাদের মধ্যে থেকে এমন এক জাতি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যারা তরবারি নয় বরং জ্ঞানবুদ্ধি, উত্তম চরিত্র ও নিজেদের পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমেই মানবজাতিকে সুপথে নিয়ে আসবে।

এখন যেহেতু নিয়ামত তথা পুরস্কারের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য থাকা একান্ত আবশ্যিক আর নিয়ামত তথা পুরস্কারের সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত হলেই পরিপূর্ণ সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব; এজন্যই এ বিষয়টির অবতারণা হয়েছে যে, যেভাবে হযরত মুসা (আ.)-কে প্রায় চৌদ্দশত বছর ধরে শরীয়তের এমন সব সেবক দান করা হয়েছে, যারা রসূল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এলহামপ্রাপ্ত ছিলেন আর সে ধারার সমাপ্তি এমন এক রসূলের মাধ্যমে হয়েছে যিনি তরবারি নয়; বরং শুধুমাত্র দয়ামায়া ও নৈতিকচরিত্রের মাধ্যমে সত্যের পানে আহ্বান জানিয়েছেন। অনুরূপভাবে, আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-কেও শরীয়তের এমন সব সেবক দান করা হয়েছে যারা হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, *عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ* [অর্থাৎ আমার উম্মতের আলেমরা বনী ইসরাঈলী নবীদের সমতুল্য। -অনুবাদক] এলহামপ্রাপ্ত ও মুহাদ্দাস ছিলেন। মুসার শরীয়তের শেষ প্রান্তে যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন, যিনি তরবারি দিয়ে নয়; বরং উন্নত নৈতিকতা ও দয়ামায়ার মাধ্যমে সত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ছিলেন, ঠিক একইভাবে এই শরীয়তের জন্যও আল্লাহ তা'লা প্রতিশ্রুত মসীহকে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনিও কেবল উন্নত নৈতিক গুণাবলি, মায়ামমতা ও ঐশী জ্যোতির মাধ্যমে সঠিক পথের প্রতি আহ্বান জানান। আবার হযরত ঈসা (আ.) যেভাবে হযরত মুসা (আ.) থেকে প্রায় চৌদ্দশ (১৪০০) বছর পর এসেছিলেন, অনুরূপভাবে এই প্রতিশ্রুত মসীহও চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হয়েছেন আর এভাবে মুহাম্মদী (শরীয়তের) ধারা মুসায়ী (শরীয়তের) ধারার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করেছে। কিন্তু যদি বলা হয়, মুসায়ী (শরীয়তের) ধারায় তো ধর্মসেবার লক্ষ্যে নবী আসতেন এবং হযরত ঈসাও নবী ছিলেন, তাহলে এর উত্তর হলো, প্রেরিত হবার ক্ষেত্রে নবী ও মুহাদ্দাস একই মর্যাদার অধিকারী। এছাড়া আল্লাহ

তা'লা যেভাবে নবীদের নাম মুরসাল বা প্রেরিত রেখেছেন, একইভাবে মুহাদ্দাসদের নামও মুরসাল রেখেছেন। এ দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যেই কুরআন শরীফে এসেছে,

وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

[অর্থাৎ আর তার পরে আমরা পর্যায়ক্রমে রসূলদের প্রেরণ করেছি। (আল-বাকার: ৮৮)– অনুবাদক] এ আয়াতে কিম্ব **وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ** [অর্থাৎ আর তার পরে আমরা পর্যায়ক্রমে নবী পাঠিয়েছি। –অনুবাদক] আসে নি। সুতরাং এটি এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করছে যে, ‘রসূল’ শব্দের অর্থ মুরসাল বা প্রেরিত; তা তিনি রসূল, নবী বা মুহাদ্দাস-ই হোন না কেন। কেননা আমাদের নেতা ও রসূল (সা.) খাতামুল আন্দিয়া আর মহানবী (সা.)-এর পরে আর কোনো নবী আসতে পারে না, তাই এ শরীয়তে মুহাদ্দাসকে নবীর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আর **وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ** [অর্থাৎ (এরা হবে) পূর্ববর্তী (মু'মিনদের) মাঝ থেকে একটি বড়ো দল এবং পরবর্তীদের মাঝ থেকেও একটি বড়ো দল (আল-ওয়াকিয়া: ৪০-৪১) –অনুবাদক]– এই আয়াত দুটিতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। যেহেতু **وَقَفَّيْنَا** শব্দটি দুটি বাক্যেই সম-অর্থ্যে এসেছে, তাই এ থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই উম্মতের মুহাদ্দাসরা তাদের সংখ্যা ও সিলসিলার দৈর্ঘ্যের দিক থেকে মূসা (আ.)-এর উম্মতের রসূলদের সমতুল্য। মূলত অন্য একটি আয়াতেও এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে আর তা হলো,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْفِنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخَفَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَكَانَ الَّذِينَ لَا يَشْرُونَ بَنِي شَيْئًا

অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের সাথে আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে সেভাবে খলীফা নিযুক্ত করবেন, যেভাবে সেসব লোককে নিযুক্ত করেছিলেন যারা তাদের পূর্বে ছিল। তাদের জন্য তিনি যে ধর্মকে পছন্দ করেছেন সে ধর্মকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন এবং তাদের জন্য ভয়ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে (আর) আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। (পারা ১৮, আন-নূর: ৫৬)

এখন মনোযোগ সহকারে দেখো, এ আয়াতেও সাদৃশ্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এ সাদৃশ্যের অর্থ যদি পূর্ণ সাদৃশ্য না হয়, তবে এ বাণীটি বৃথা সাব্যস্ত হয়। কেননা মূসার শরীয়তে শুধু ত্রিশ বছর নয় বরং চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত খিলাফতের ধারা বজায় ছিল এবং এমন নয় যে শুধু চার খলীফার পরই চিরতরে শেষ; বরং আধ্যাত্মিক ও জাগতিকভাবে শত শত খলীফা হয়েছেন।

আর যদি বলা হয়, مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্যে থেকে) শব্দটি নির্দেশ করে যে, সেসব খলীফা কেবল সাহাবীদের মধ্যে থেকে হবেন, কেননা مِنْكُمْ শব্দে কেবল সাহাবীরা যদি সম্বোধিত হন, তাহলে এটি হবে একটি সুস্পষ্ট ভ্রান্তধারণা। এছাড়া এ ধরনের উক্তি কেবল এমন ব্যক্তির মুখেই শোভা পায় যে কখনো গভীর মনোযোগের সাথে পবিত্র কুরআন পাঠ করে নি এবং এর বাচনভঙ্গি সম্বন্ধেও অজ্ঞ। কেননা একথাই যদি সত্য হয় যে, সম্বোধনের সময় কেবল তারাই (সম্বোধিত বলে) বিবেচিত হয়, যারা তৎকালীন যুগে ঈমানদার হিসেবে জীবিত থাকে! তাহলে এমন কথা বললে গোটা কুরআন শরীফই তছনছ হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আয়াতের অনুরূপ আরো আয়াত রয়েছে, যেখানে একইভাবে শব্দের বাহ্যিক ব্যবহারের নিরিখে সেসব লোক সম্বোধিত যারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং সেই সময় জীবিত ছিল। বরং এসব আয়াতে তো একথার সমর্থনে খুবই জোরালো লক্ষণ বিদ্যমান যে, মূলত তারাই সম্বোধিত। আর সেই আয়াতগুলো হলো,

قَالَ سَتَرْتُ لِبَنَائِهِمْ وَنَسَيْتُ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ○ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْمَعُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○ قَالُوا أَوِذِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ○

অর্থাৎ ফেরাউন বলল, আমরা বনী ইসরাঈলের ছেলেদের হত্যা করব এবং মেয়েদের জীবিত রাখব, নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর ক্ষমতাবান। তখন মূসা তার জাতিকে বলল, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্য ধরো; পৃথিবীর মালিক খোদা, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানান আর শুভ পরিণতি কেবল পুণ্যবানদের হয়ে থাকে। তখন মূসার জাতি তাকে উত্তর দিল, তোমার পূর্বেও আমরা নির্যাতিত ছিলাম আর

তোমার আগমনের পরও নির্যাতিত হয়েছি। উত্তরে মূসা বলল, (সে সময়) খুব নিকটে (যখন) আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নির্বাচিত করবেন এরপর দেখবেন, তোমরা কেমন আচরণ করো। (আল-আরাফ: ১২৮-১৩০)

এখন এসব আয়াতে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে হযরত মূসার জাতির মধ্যে থেকে সেসব লোকই সম্বোধিত যারা তাঁর সামনে জীবিত উপস্থিত ছিল আর তারা ফেরাউনের নিপীড়ন ও নির্যাতনের অভিযোগও করেছিল এবং বলেছিল, আমরা তোমার আগেও নির্যাতিত হয়েছি আর তোমার আগমনের পরেও হচ্ছি। তখন তাদের উদ্দেশ্যেই তিনি বলেছিলেন, এই দুঃখকষ্টের মাঝে তোমরা ধৈর্য ধরো, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দেবেন এবং তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন আর পৃথিবীতে তোমাদের খলীফা বানাবেন। কিন্তু ঐতিহাসিকদের নিকট এটি স্পষ্ট আর যারা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের বইপুস্তক অধ্যয়ন করেছে তারাও খুব ভালোভাবে জানেন যে, সেই জাতির শত্রু ফেরাউন তাদের সামনে ধ্বংস হলেও তারা নিজেরা এ পৃথিবীতে জাগতিক খিলাফতও লাভ করে নি আর আধ্যাত্মিক খিলাফতও পায় নি; বরং অবাধ্যতার দরুন তাদের অধিকাংশই ধ্বংস হয়েছে এবং জনমানবশূন্য মরুভূমিতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ছন্নাছাড়া জীবনযাপনের পর মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছে। তাদের মৃত্যুর পর তাদের বংশধরদের মাঝে খিলাফতের এমন এক ধারা সূচিত হয় যার ফলে এ জাতির মাঝে অনেক রাজাবাদশা হয়েছেন এবং এ জাতির মাঝেই দাউদ ও সুলায়মানের মতো খলীফাতুল্লাহ জন্ম নিয়েছেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত খিলাফতের এই ধারা চতুর্দশ শতাব্দিতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট হলো, সমসাময়িক কোনো জাতি বা গোষ্ঠীকে সম্বোধন করলে তা শুধু সমসাময়িক জাতি বা গোষ্ঠী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে— এটি কখনোই আবশ্যিক নয়; বরং পবিত্র কুরআনে তো এমন বাগ্‌ধারাও বিদ্যমান যেখানে অনেক সময় এক জাতিকে সম্বোধন করে কিন্তু সত্যিকার অর্থে সম্বোধিত হয় অন্য এমন সব মানুষ যারা অতীত হয়ে গেছে অথবা ভবিষ্যতে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ সূরা আল-বাকারাতে সমসাময়িক ইহুদীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

يَبْنَئِ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
وَأَوْفُوا بَعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّائِي فَارْهَبُونَ

অর্থাৎ স্মরণ করো! সেই সময়কে যখন মূসাকে তোমরা বলেছিলে, আল্লাহ্কে আমরা স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত শুধু তোমার কথায় ঈমান আনব না। তখন তোমাদের ওপর বজ্রপাত ঘটে আর এরপর তোমাদের জীবিত করা হয়, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। এছাড়া আমরা তোমাদের ওপর মেঘের ছায়া বিস্তৃত করেছি এবং তোমাদের জন্য ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ অবতীর্ণ করেছি। (আল-বাকার: ৫৬-৫৮)। এখন এটি তো সুস্পষ্ট যে, কুরআন শরীফে যাদের সম্বোধন করা হয়েছে সেসব ইহুদীর দুই হাজার বছর পূর্বেই হযরত মূসা (আ.) মারা গেছেন আর হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে তো তাদের নামগন্ধও ছিল না। তাহলে তাদের জন্য কীভাবে সম্ভবপর ছিল যে, তারা হযরত মূসা (আ.)-কে প্রশ্ন করবে? তাদের ওপর কোথায় বজ্রপাত হয়েছিল আর কোথায়ইবা তারা ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ খেয়েছিল? তাহলে কি তারা হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে অন্য কোনো অবয়ব বা আকৃতিতে ছিল আর পরে জন্মান্তরের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগেও এসে উপস্থিত হয়েছে? যদি এমনটি না হয় তাহলে এই ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে যে, সম্বোধনের সময় যারা সম্বোধিত হয়, তারাই আসলে উল্লিখিত ঘটনার সত্যায়নকারী- সত্যায়নস্থল হবে তা আবশ্যিক নয়। ঐশীবাণী পবিত্র কুরআন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসের ক্ষেত্রে একটি রীতি হলো, কখনো কখনো একটি ঘটনাকে কোনো এক ব্যক্তি বা জাতির প্রতি আরোপ করা হয়, কিন্তু বাস্তবে তা অন্য কোনো জাতি বা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে। ঈসা ইবনে মরিয়মের আগমনের খবরও এমনই একটি খবর, কেননা কোনো কোনো হাদীসে শেষযুগে ঘটিতব্য একটি ঘটনাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে, অথচ তিনি প্রয়াত ছিলেন। তাই এ ঘটনাটিও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি সেভাবেই আরোপিত হয়েছে, যেভাবে ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি পাবার, ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ খাওয়ার, বজ্রপাত হবার, সমুদ্র পাড়ি দেবার এবং كُنْ تُصِيرْ عَلَىٰ طَعَامِهِ وَاجِدْ [অর্থাৎ আমরা একই ধরনের খাবারে আদৌ ধৈর্য ধরতে পারব না। (আল-বাকার: ৬২) -অনুবাদক]-এর ঘটনা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে বিদ্যমান ইহুদীদের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। যদিও এসব ঘটনা ছিল তাদের পূর্ববর্তী জাতির, যারা তাদের শত শত বছর পূর্বে মারা গিয়েছিল। সুতরাং আয়াতের অর্থ করার ক্ষেত্রে কারো যদি যৌক্তিক দিকের প্রতি মনোযোগ না থাকে এবং বাহ্যিক শব্দে অনড় থাকা আবশ্যিক জ্ঞান করে, তাহলে কমপক্ষে

এসব আয়াত থেকে ‘জন্মান্তরবাদ’-এর বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হবে। অন্যথায় এটি কীভাবে সম্ভব যে, একজন কর্তার কর্মকে আল্লাহ তা’লা এমন এক ব্যক্তির প্রতি আরোপ করেন, যে কর্ম সম্পাদনে তার কোনো ভূমিকাই নেই? অথচ তিনি নিজেই বলেছেন, **لَا يُكَلِّفُ الْوَعْدَ الْوَعْدَ** [অর্থ: কোনো বোঝা বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। (বনী ইসরাঈল: ১৬) -অনুবাদক]? কাজেই মূসা (আ.)-এর জাতি যদি হযরত মূসার অবাধ্যতা করে থাকে, তাদের ওপর যদি বজ্রপাত হয়ে থাকে অথবা তারা যদি গোবৎসের পূজা করে থাকে এবং তাদের ওপর যদি শাস্তিও আপতিত হয়ে থাকে তাহলে এসব ঘটনার সাথে দুই হাজার বছর পর জন্ম নেওয়া অন্য জাতির কী সম্পর্ক? এমনিতে তো হযরত আদম (আ.) হতে আজ অবধি পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য পিতৃপুরুষতুল্য, কিন্তু (তাই বলে তো আর) কারো পাপের বোঝা অন্য কারো ওপর চাপানো যেতে পারে না! পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’লা আরো বলেছেন, তোমরা মূসার অবাধ্যতা করেছ এবং তোমরা বলেছ, আল্লাহকে আমরা না দেখা পর্যন্ত মানবো না। এ পাপের জন্য তোমাদের ওপর বজ্রপাত হয়েছে। বাহ্যদৃষ্টিতে এছাড়া অন্য কোনো অর্থ কীভাবে হতে পারে যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে বিদ্যমান সেই সকল ইহুদী মূলত হযরত মূসা (আ.)-এর যুগেও উপস্থিত ছিল আর তাদের প্রতিই ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের ওপরই বজ্রপাত হয়েছিল, তাদের খাতিরেই ফেরাউনকে ধ্বংস করা হয়েছিল এবং সেই ইহুদীরাই আবার জন্মান্তরের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করে আর এভাবেই বক্তব্যটি যথার্থ সাব্যস্ত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো! তাহলে কেন সরাসরি এমন অর্থ করা হয় না, এটি করা কি আল্লাহ তা’লার ক্ষমতার উর্ধ্বে? তবে কেন এমন অর্থ গ্রহণ করা হয় যা টেনে হেঁচড়ে করা হয়? আল্লাহ তা’লা কি এমনটি করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান নন? যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকে, হযরত ঈসা (আ.)-কে তিনি শত শত বছর পর কোনো এক সময় নশ্বর মানবীয় দেহসহ-ই পুনরায় পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন, ঠিক একইভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের সেসব ইহুদীকেও তিনি মহানবী (সা.)-এর যুগে জীবিত করে দিয়ে থাকবেন অথবা তাদের আত্মাগুলোকে জন্মান্তরের মাধ্যমে পুনরায় পৃথিবীতে নিয়ে এসে থাকবেন। যেমনটি কিনা শুধু ভিত্তিহীন কিছু উক্তির ওপর নির্ভর করে হযরত ঈসা (আ.)-এর আত্মার পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার

বিষয়টি মেনে নেওয়া হয়েছে, তবে কেন এবং কী কারণে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর যুগে জন্মান্তরের মাধ্যমে সেসব ইহুদীর আত্মার পুনরায় ফিরে আসার বিষয়টি মানা হবে না? যাদের উপস্থিতির বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল আয়াতসমূহ সাক্ষ্য বহন করছে। দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন,

وَإِذْ قُلْتُمْ يُوسَىٰ كُنْ نَذِيرًا لِّكَ حَتَّىٰ نُرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الطُّغْيَانُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

(আল-বাকারা: ৫৬)

অর্থাৎ স্মরণ করো! সেই সময়কে যখন অন্য কেউ নয়; বরং তোমরাই বলেছিলে, আল্লাহ্কে আমরা প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত শুধু তোমার কথায় ঈমান আনব না। তখন তোমাদের ওপর বজ্রপাত হলো আর তোমরা (তা) দেখেছিলে। এ আয়াতের আরেকটি সূক্ষ্ম দিক হলো, যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতের বিষয়বস্তুতে তদানীন্তন ইহুদীদেরকে অতীতের লোকদের স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করেন নি; বরং সত্যিকার অর্থেই তাদেরকে অতীতের লোক আখ্যায়িত করেছেন। অতএব এমতাবস্থায় পবিত্র কুরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কল্যাণময় যুগের ইহুদীদেরও সেই নামই রেখেছে, যা অতীতের সেসব বনী ইসরাঈলের নাম ছিল, কেননা এসব লোককে যেহেতু আক্ষরিক অর্থেই সেসব লোক হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাই নামও সেই একই হওয়া আব্যশ্যক ছিল। কেননা নাম সত্যের জন্য অবিচ্ছেদ্য উপসর্গের ন্যায় আর আবশ্যকীয় উপসর্গগুলো স্বীয় সত্য বা বাস্তবতা হতে পৃথক হতে পারে না। এখন খুব মনোযোগের সাথে ভেবে দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা যখন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মহানবী (সা.)-এর যুগের ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে তোমরাই এমনসব অপকর্ম করেছ, তাই এমন সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার (কুরআনী) আয়াতের ব্যাখ্যা করা এবং পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে মৃত হযরত ঈসা (আ.)-কে হাদীসের ভিত্তিতে পুনরায় পৃথিবীতে নামিয়ে আনাটা কেমন অন্যায় ও অবিচার? হে বন্ধুগণ! প্রয়াত লোকদের পুনরায় পৃথিবীতে নিয়ে আসা যদি আল্লাহ্ তা'লার রীতি ও সুনীত হতো, তাহলে কুরআনের যে আয়াত প্রয়াত লোকদের বার বার সম্বোধন করে তাদের জীবিত হবার সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাকে উপেক্ষা করা আদৌ বৈধ নয়। সেক্ষেত্রে হৃদয়ে যদি এই আশঙ্কা বিরাজ করে যে, এমন অর্থ করা আল্লাহ্

তা'লার ক্ষমতার উর্ধ্বে না হলেও অযৌক্তিক, তাহলে এজন্যই ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় এবং সেই অর্থই করা হয় যা বিবেকসম্মত। অতএব হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাব-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রেও তেমন অর্থই করা উচিত, কেননা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর আশিসপূর্ণ যুগে প্রয়াত ইহুদীদের জীবিত হওয়া বা জন্মান্তরের মাধ্যমে তাদের আত্মার পুনরাগমন যদি অযৌক্তিক হয়, তাহলে হযরত ঈসার পুনরায় পৃথিবীতে আগমনের বিষয়টি কীভাবে প্রস্তাব করা যেতে পারে, যাঁর মৃত্যু সম্পর্কে

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

[অর্থাৎ কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে। (আল-মায়দা: ১১৮) -অনুবাদক]- আয়াতটি বজ্রকণ্ঠে সাক্ষ্য দিচ্ছে? পৃথিবীতে ইহুদীদের আত্মাগুলোর পুনরাগমন কি আল্লাহ তা'লার ক্ষমতার উর্ধ্বে এবং অযৌক্তিক? কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-এর নশ্বর মানবদেহসহ পুনরায় পৃথিবীতে আগমন খুবই যৌক্তিক? এছাড়া কুরআনের সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার আয়াতের ক্ষেত্রেও যদি অর্থের প্রয়োজনে আক্ষরিক অর্থ উপেক্ষা করে ভাবার্থ গ্রহণ করা যায়, তাহলে হাদীসের ক্ষেত্রে কেন আক্ষরিক অর্থ উপেক্ষা করা যাবে না? হাদীস শরীফ কি পবিত্র কুরআনের চেয়ে অধিক মর্যাদা রাখে, যার ফলে খুব অযৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের অর্থ সর্বদাই আক্ষরিক করতে হবে আর কুরআনের অর্থ করার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাও করতে হবে? পুনরায় আমরা মূল আলোচ্য বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করছি, কেননা কোনো কোনো ব্যক্তি-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

(আন-নূর: ৫৬)

[অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন।-অনুবাদক]- আয়াতের সর্বজনীনতা অস্বীকার করে বলে থাকে مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্যে থেকে- অনুবাদক) শব্দ কেবল সাহাবীদেরই বুঝায় এবং

খিলাফতে রাশেদা তাদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে, এরপর কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামে এ খিলাফতের আর নামগন্ধও থাকবে না। মনে হয় যেন কেবল এক স্বপ্ন ও কল্পনার ন্যায় ত্রিশ বছর পর্যন্তই এ খিলাফতকাল বিস্তৃত ছিল আর ইসলাম চিরকালের জন্য অন্তহীন দুর্দশায় নিপতিত হয়েছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, কোনো পবিত্রচেতা মানুষ কি এরূপ মতামত ব্যক্ত করতে পারে? অর্থাৎ হযরত মুসা (আ.) সম্পর্কে তো তারা বিশ্বাস করে, নিঃসন্দেহে তাঁর শরীয়তের কল্যাণ ও খিলাফতে রাশেদার যুগ লাগাতার চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কিন্তু সেই নবী- যিনি আফযালুর রসূল তথা সর্বোত্তম রসূল এবং খায়রুল আম্মিয়া তথা নবীকুল শিরোমনি আখ্যায়িত হন, যার শরীয়তের আঁচল কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর কল্যাণরাজি যেন কেবল তাঁর যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল আর তাঁর আধ্যাত্মিক খলীফাদের মাধ্যমে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁর কল্যাণরাজির দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হোক- তা আল্লাহ্ তা'লা চান নি, এমন কথা শুনে তো আমাদের গা শিউরে ওঠে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, সেসব লোকও মুসলমান হবার দাবি করে, যারা নিছক চালাকি ও ধৃষ্টতার সাথে এমন অশালীন কথা মুখে আনে যেন পরবর্তীতে ইসলামের কল্যাণধারা ভবিষ্যতে প্রবাহিত তো হবেই না; বরং বহুকাল পূর্বেই এর অবসান ঘটেছে।

এছাড়া مِنْكُمْ (মিনকুম) শব্দের মাধ্যমে এ প্রমাণ উপস্থাপনের অপচেষ্টা করা যে, যেহেতু (এর দ্বারা) সাহাবীদের সম্বোধন করা হয়েছে, তাই এই খিলাফতও সাহাবা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ- এটি অদ্বৃত্ত বুদ্ধিমত্তাই বটে। কুরআনের তফসীর যদি এভাবেই করা হয়, তাহলে এটি ইহুদীদেরও হার মানানোর মতো বিষয়। এখন উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্যে থেকে- অনুবাদক) শব্দটি কুরআন শরীফের প্রায় ৮২ স্থানে এসেছে। যেখানে বিশেষ কোনো ইঙ্গিত করা হয়েছে এমন দু-তিনটি স্থান ব্যতীত বাকি সবগুলো স্থানে مِنْكُمْ শব্দের সম্বোধনে কিয়ামত অবধি জন্ম নেওয়া সকল মুসলমানকে বুঝানো হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, এখন আমরা এমন কতিপয় আয়াত উল্লেখ করছি, যেখানে مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্যে থেকে- অনুবাদক) শব্দটি বিদ্যমান।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ১। অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে যারা অসুস্থ অথবা সফরে আছে তারা যেন পরবর্তীতে ততগুলো রোযা রেখে

নেয়। (আল-বাকার: ১৮৫)। একটু ভেবে দেখুন! এ আদেশ কি বিশেষভাবে শুধু সাহাবীদের জন্যই প্রযোজ্য ছিল, নাকি কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী মুসলমানরাও এতে অন্তর্ভুক্ত? অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর প্রতিও অভিনিবেশ করুন—

২। ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে যারা আল্লাহ্ এবং বিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। (আল-বাকার: ২৩৩)

৩। وَالَّذِينَ يُؤَقِّتُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُدُونَ أَزْوَاجًا ۚ অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়। (আল-বাকার: ২৩৫)

৪। وَتِلْكَ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْوَةِ الْيُسْخَرُ عَنْ الْمُنْكَرِ ۚ অর্থাৎ তোমাদের মাঝে এমন লোক হওয়া উচিত, যারা পুণ্যের দিকে আহ্বান করবে, সঠিক কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (আলে ইমরান: ১০৫)

৫। اِنِّىْٓ اَرْسَلْتُ عَلٰى عَمَلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ অর্থাৎ আমি তোমাদের কোনো সৎকর্মশীল ব্যক্তির সৎকর্ম বৃথা যেতে দেবো না— হোক না সে কোনো পুরুষ বা নারী। (আলে ইমরান: ১৯৬)

৬। لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ অর্থাৎ পরস্পরের সম্পদকে তোমরা অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে এমন ব্যবসার কথা ভিন্ন যাতে পারস্পরিক সম্মতি থাকে। (আন-নিসা: ৩০)

৭।

وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُّرْضٰى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لِمَسْتَمُّ السَّيِّئِ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَبَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

(আল-মায়দা: ৭)

অর্থাৎ তোমরা যদি অসুস্থ হও বা সফরে থাকো অথবা শৌচাগার থেকে আসো কিংবা স্ত্রীগমন করো আর পানি না পাও তবে এসব অবস্থায় পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো।

৮। اطِيعُوا الرُّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্, রসূল এবং তোমাদের কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করো। (আন-নিসা: ৬০)

৯। مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি তার অজ্ঞতার কারণে কোনো মন্দকর্ম করে, অতঃপর তওবা করে ও পুণ্যকর্মে আত্মনিয়োগ করে, তবে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী। (আল-আনআম: ৫৫)

১০। فَبَاذِلْهُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, পার্থিব জীবনে সে লাঞ্ছিত হবে আর কিয়ামতের দিন তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (আল-বাকারাহ: ৮৬)

১১। وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে না। (মারইয়াম: ৭২)

১২। وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ অর্থাৎ আমরা তাদের সম্বন্ধে খুব ভালোবাবে জানি যারা তোমাদের মধ্যকার অগ্রগামী এবং যারা পিছিয়ে থাকে। (আল-হিজর: ২৫)

এখন এই আয়াতগুলোতে লক্ষ করুন! যেখানে مِنْكُمْ শব্দটি সমস্ত মুসলমানের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য, তারা সেই সময় বিদ্যমান থাকুক অথবা পরবর্তীতে কিয়ামত পর্যন্তই জন্ম নিক না কেন। এভাবে দু-তিনটি স্থান ব্যতীত বাকি সব স্থানেই সর্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামের সমস্ত বিধিবিধানের ক্ষেত্রে বাহ্যত সাহাবীরাই সম্বোধিত হয়েছেন, কিন্তু একে যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া সাহাবীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা বৈধ নয়। অন্যথায় যে কোনো পাপাচারী অজুহাত দাঁড় করিয়ে বলতে পারে— রোযা, নামায, হজ্জ, তাকওয়া, তাহারাত এবং পাপ-পঙ্কিলতা হতে বিরত থাকা সংক্রান্ত যে-সব বিধান রয়েছে, তাতে শুধু সাহাবীদেরই সম্বোধন করা হয়েছে, কাজেই আমাদের নামায, রোযা ইত্যাদি পালনের বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই। একথা সুস্পষ্ট যে, এমন কথা একজন নাস্তিক ছাড়া অন্য কোনো খোদাশ্রমী মানুষ বলতেই পারে না।

কারো মনে যদি এমন ধারণা জন্মে যে, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا [অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন -অনুবাদক] আয়াত যদি

সর্বজনীন অর্থ দেয়, অর্থাৎ প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি বিশেষ না হয়ে সাধারণ হয়ে থাকে, তাহলে এখানে অতিরিক্ত **مِنْكُمْ** শব্দটি কেন যোগ করা হয়েছে? শুধু এটুকু বললেই হতো—

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

[অর্থাৎ যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। -অনুবাদক] এর উত্তর হলো, এ অঙ্গীকার সেসব ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ লোকের বিপরীতে ছিল, যারা এ উম্মতের পূর্বে ছিল। অতএব এ আয়াতের বিস্তারিত বিবরণ কিছুটা এমন যে, তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে আল্লাহ তা'লা সেসব লোককে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন, যারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ ছিল এবং নিজেদের ঈমানের সাথে সৎকর্মও করত। অপরদিকে আল্লাহ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন, হে মুসলমানরা! তোমাদের মধ্যে থেকেও যারা এই অনুপম গুণাবলির অধিকারী হবে এবং ঈমানের পাশপাশি সৎকর্মও করবে তাদের তিনি খলীফা নিযুক্ত করবেন। অতএব **مِنْكُمْ** শব্দটি অতিরিক্ত নয়; বরং ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের প্রতি ইঙ্গিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। কেননা এ আয়াতে সৎকর্মপরায়ণ ও ঈমানদার শব্দ দুটি যেহেতু পূর্ববর্তী উম্মত ও এ উম্মতের ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের জন্য সমভাবে প্রয়োগ হয়েছে, কাজেই বিশেষ কোনো শব্দ না হলে বাক্যটি দুর্বল, অস্পষ্ট ও বাগ্মিতাশূন্য হতো। **مِنْكُمْ** শব্দের মাধ্যমে একথার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, অতীতেও ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছিল আর তোমাদের মধ্য থেকেও ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরই খলীফা নিযুক্ত করা হবে। এখন দেখার মতো চোখ থাকলে দেখুন! সাধারণ অর্থে **مِنْكُمْ** শব্দটি অতিরিক্ত কোথায় এবং দ্বিগুণিহা কীভাবে হয়েছে? ঈমান ও সৎকর্ম যখন এই উম্মত হতেই শুরু হয় নি; বরং অতীতেও মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ মানুষ ছিল, এমতাবস্থায় **مِنْكُمْ** শব্দটি ছাড়া পরিপূর্ণ পার্থক্য করা কীভাবে সম্ভব? শুধু যদি এমন হতো যে, **وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** [অর্থাৎ যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন- অনুবাদক] তাহলে কিছুই বুঝা যেত না এখানে কোন ঈমানদারের কথা উল্লেখ রয়েছে, এ উম্মতের ঈমানদার নাকি বিগত উম্মতের? আর যদি শুধু **مِنْكُمْ** থাকত এবং **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** [অর্থাৎ যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে -অনুবাদক] না থাকত, তাহলে মনে হতো সীমালঙ্ঘনকারী ও দুষ্ট লোকেরাও আল্লাহ তা'লার খলীফা হতে পারে, অথচ সীমালঙ্ঘনকারীদের রাজত্ব ও সরকার তো নির্বাচনরূপে নয় বরং পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে থাকে। যারা মুত্তাকী, ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ তারাই আল্লাহ তা'লার সত্যিকার খলীফা- হোক তা আধ্যাত্মিক বা জাগতিক খলীফা।

এছাড়া এমন ধারণা করা যে, সাধারণ অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এ আয়াতের শেষাংশ, অর্থাৎ **وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ** [অর্থ: আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতকারী। (আন-নূর: ৫৬) -অনুবাদক] পুরোপুরি অর্থহীন সাব্যস্ত হয়। এটি এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা যা শুনলে হাসি পায়। কেননা এ আয়াতের সুস্পষ্ট ও সাবলীল অর্থ হলো, মহাপ্রতাপাশ্রিত আল্লাহ খলীফা হবার সুসংবাদ দেবার পর বিদ্রোহী ও অবাধ্যদের সতর্ক করে বলেছেন, বিভিন্ন সময় যখন খলীফা মনোনীত হবেন, তখন তাঁদের মনোনয়নের পর যদি কেউ ঔদ্ধত্য দেখায় এবং আনুগত্য ও বয়আত করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সে দুষ্কৃতকারী। এখন এই অর্থের ভুলটা কোথায়? বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এ আয়াতের সাথে মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীস সামঞ্জস্যপূর্ণ যাতে তিনি (সা.) বলেছেন, **مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ** অর্থ: যে ব্যক্তি তার যুগের ইমামকে চিনতে পারে নি, তার মৃত্যু অজ্ঞতার মৃত্যু হবে। অর্থাৎ যুগে যুগে ইমাম নিযুক্ত হলে তাঁদের যারা শনাক্ত করতে ব্যর্থ হবে তাদের মৃত্যু হবে কাফিরদের মৃত্যুতুল্য। আপত্তিকারীর আয়াত-

قَالَ اللَّهُ إِنَّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَنِّكُمْ
فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ

(আল-মায়দা: ১১৬)

[অর্থাৎ আল্লাহ বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এ (খাঞ্চা)টি অবতীর্ণ করব। কিন্তু এরপর তোমাদের মাঝে থেকে যে-ই অকৃতজ্ঞতা করবে আমি তাকে এমন কঠোর শাস্তি দেবো যা বিশ্বজগতের অন্য কাউকে দেবো

না। -অনুবাদক]- উপস্থাপন করা এবং এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, এখানে مِنْكُمْ শব্দটি বিশেষভাবে তৎকালীন সময়ে উপস্থিত লোকদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে- এটি একটি অর্থহীন কথা, কেননা (ইতঃপূর্বেই) আমরা লিখেছি, পুরো কুরআন শরীফ এমন বাগ্‌ধারায় পূর্ণ যে, সম্বোধন ও আদেশ সর্বজনীন ও সকল উম্মতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য আর তা কেবল সাহাবীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। তবে হ্যাঁ! যেখানে সুস্পষ্টরূপে সম্বোধন সীমাবদ্ধ রাখার ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যতিক্রম। যেভাবে উল্লিখিত আয়াতে হাওয়ারীদের একটি বিশেষ দল, মায়েদা তথা খাশ্বা অবতীর্ণের নিবেদন করেছে আর সেই দলকে সম্বোধন করেই উত্তর এসেছে। অতএব এতটুকু যুক্তিই যথেষ্ট যে, এ দলই যাচনা করেছে আর তারাই উত্তর পেয়েছে। কুরআন শরীফে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে- একথা বলা সর্বৈব মিথ্যা ও প্রতারণা বইকি? কুরআন শরীফে প্রায় ৮২ বার مِنْكُمْ শব্দটি এসেছে এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে আরো প্রায় ছয়শর মতো সম্বোধন রয়েছে, কিন্তু নির্দেশমূলক সকল সম্বোধন ইত্যাদিতে লক্ষ্য হলো সর্বসাধারণ। কুরআনের নির্দেশাবলি যদি কেবল সাহাবা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকত তবে তো সাহাবীদের মৃত্যুর সাথে সাথেই কুরআন শরীফ বাতিল হয়ে যেত। খিলাফত সম্পর্কিত যে আয়াতটি নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে তা আসলে এ আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ,

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

[অর্থাৎ তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনেও এবং পরকালেও। (ইউনুস: ৬৫) -অনুবাদক]- এ সুসংবাদ কি শুধু সাহাবীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল, নাকি অন্যদেরও এতে অংশ আছে? আপত্তিকারীর একথা বলা, যে-ব্যক্তি মূল অর্থ, অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণিকে সম্বোধনের অর্থ বাদ দিয়ে সাধারণ বা সর্বজনীন অর্থ নিতে চায় তার দায়িত্ব হবে, মূল অর্থ পরিত্যাগের স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করা। আপত্তিকারীর এমন কথা প্রমাণ করে, শুধু কুরআন শরীফেরই নয়; বরং সকল ঐশীগ্রন্থের বাচনভঙ্গি সম্পর্কেই তিনি পুরোপুরি অজ্ঞ। দুঃখের বিষয় হলো, অধিকাংশ ত্বরাপারায়ণ লোক ভালোভাবে গবেষণা না করেই আপত্তি করতে দাঁড়িয়ে যায়। আপত্তিকারী মহোদয়ের যদি গবেষণা করার সদিচ্ছা থাকত, তাহলে তিনি সেই সবগুলো ক্ষেত্র বাহ্যত যেখানে সাহাবীদের সম্বোধন করা হয়েছে, একত্র করে দেখতেন যে, বিশেষ

ইঙ্গিত ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কুরআন শরীফের বাগ্‌ধারা কী? কেননা স্পষ্ট বিষয় হলো, যে বাগ্‌ধারাটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বলে প্রমাণিত হবে, মূল অর্থও সেটির সাথে সংগতিপূর্ণ হবে আর বিশেষ কোনো ইঙ্গিত ছাড়া সেগুলোকে পরিত্যাগ করা বৈধ হবে না। এখন যে বিষয়টি পরিস্কার হওয়া দরকার তা হলো, উপস্থিত লোকদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের বাগ্‌ধারা সর্বজনীন হয়ে থাকে এবং এ রীতির ওপর ভিত্তি করেই কুরআনের ৬০০ আদেশকে সর্বজনীন মনে করা হয় আর সাহাবীদের জন্যই সীমাবদ্ধ বলে জ্ঞান করা হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি সাধারণ ও সর্বজনীন বাগ্‌ধারা পরিত্যাগ করে কোনো আদেশকে কেবল সাহাবীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখে তার দায়িত্ব হলো, স্পষ্ট লক্ষণাবলির ভিত্তিতে এটি প্রমাণ করা যে, এই সম্বোধন বিশেষভাবে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে আর বাকিরা এর আওতার বাইরে। উদাহরণস্বরূপ, মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বাহ্যত সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেছেন, (১) তোমরা শুধুমাত্র খোদার ইবাদত করো। (২) ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। (৩) আর পবিত্র জিনিস খাও। (৪) কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা করো না। (৫) আর তোমরা যাকাত দাও। (৬) নামায কয়েম করো। (৭) মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাও। (৮) পুণ্যকর্মে পরস্পর প্রতিযোগিতা করো। (৯) আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। (১০) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। (১১) আমার কাছে প্রার্থনা করো। (১২) যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় তাদের মৃত বোলো না। (১৩) আর যারা তোমাদের আসসালামু আলাইকুম বলে তোমরা তাদের নাম কাফির ও বেঈমান রেখো না। (১৪) জমিতে উৎপন্ন পবিত্র জিনিস খাও। (১৫) শয়তানের অনুসরণ করো না। (১৬) তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। (১৭) কিন্তু তোমাদের মাঝে যারা অসুস্থ অথবা সফরে আছে তারা যেন সেই রোযাগুলো পরবর্তীতে রাখে। (১৮) তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করো না। (১৯) তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, যেন সফল হও। (২০) আল্লাহ্র পথে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। (২১) কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। (২২) তোমরা কেউ বাড়াবাড়ি করো না, কেননা যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন না। (২৩) তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করো। (২৪) নিজেই নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও

না। (২৫) মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো, কেননা অনুগ্রহশীলকে আল্লাহ ভালোবাসেন। (২৬) আল্লাহর খাতিরে তোমরা হজ্জ ও উমরা করো। (২৭) আর নিজের কাছে পাথেয় রাখো, কেননা পাথেয় রাখার উপকার হলো, তোমাদেরকে অন্য কারো কাছে হাত পাততে হবে না, অর্থাৎ হাত পাতা এক ধরনের লাঞ্ছনা, এ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করো। (২৮) আর তোমরা সন্ধি ও শান্তিতে প্রবেশ করো। (২৯) ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক নারীদের তোমরা বিয়ে করো না। (৩০) হে নারী সম্প্রদায়! ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না। (৩১) আর নিজের আত্মার জন্য কিছু অগ্রে প্রেরণ করো। (৩২) আর আল্লাহকে নিজেদের কসমের লক্ষ্যে পরিণত করো না। (৩৩) আর কষ্ট দেবার উদ্দেশ্য মহিলাদের আটকে রেখো না। (৩৪) আর তোমাদের মধ্যে থেকে যাদের মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রী জীবিত থাকবে তারা, (অর্থাৎ বিধবারা) যেন চার মাস দশ দিন বিয়ে করা থেকে বিরত থাকে। (৩৫) তোমরা তালাক দিলে মহিলাদের উত্তমরূপে বিদায় দিও। (৩৬) ভয়ের আশঙ্কা থাকলে তোমরা হেঁটে হেঁটে অথবা বাহনে বসা অবস্থায় নামায পড়ো। (৩৭) মানুষকে দেখিয়ে তোমাদের দানখয়রাত করা সাধারণত ভালো কাজ, কেননা মানুষ যেন তোমাদের পুণ্যকর্মের অনুসরণ করে। আর গোপনে অভাবীদের দান করলে তা তোমাদের আত্মার জন্য উত্তম। (৩৮) কাউকে ঋণ দেবার সময় তুমি একটি ঋণপত্র লিখিয়ে নিও। (৩৯) ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করো এবং কিছুই বাকি রেখো না। (৪০) ক্রয়বিক্রয়ের সময় তোমরা সাক্ষী রেখো। (৪১) তোমরা যদি সফরে থাকো আর কোনো লেখক না পাও তবে কোনো সম্পদ বন্ধক রেখো। (৪২) তোমরা সবাই সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পরের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করো না। (৪৩) তোমাদের মাঝে এমন লোকও থাকা উচিত, যারা সৎকর্মে আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (৪৪) তোমরা আল্লাহর ক্ষমার দিকে ধাবিত হও। (৪৫) আর তোমাদের কারো নিঃসন্তান স্ত্রী মারা গেলে সে তার অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হবে। (৪৬) কিন্তু সন্তান থাকলে ওসিয়্যত পরিশোধের পর এক-চতুর্থাংশ পাবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই অল্প কয়েকটি বিধিনিষেধ আমরা উল্লেখ করলাম, এখান থেকে স্বল্পজ্ঞানী একজন মানুষও বুঝতে পারে, বাহ্যত সাহাবীদের উদ্দেশ্যেই এসব সম্বোধন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মুসলমানই এসব আদেশ পালনের

জন্য আদিষ্ট হয়েছে, শুধু সাহাবীরাই নয়। মোটকথা, পবিত্র কুরআনের প্রকৃত ও সত্যিকার বাচনভঙ্গি যাতে পবিত্র কুরআন পরিপূর্ণ তা হলো, বাহ্যত শুধু সাহাবীরাই সম্বোধিত মনে হলেও সত্যিকার অর্থে ও নিশ্চিতরূপে কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম নেওয়া সমস্ত মুসলমানই এ সম্বোধনের আওতাধীন। অতএব যে ব্যক্তি দাবি করে, এসব প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী সাহাবীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ সে আসলে কুরআন শরীফের সাধারণ বা সর্বজনীন বাগ্‌ধারাকে পরিত্যাগ করে। এ দাবির স্বপক্ষে সঠিক যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন না করে এমন পস্থা অবলম্বন করলে সে একজন নাস্তিক হিসেবে বিবেচিত হবে। কুরআন শরীফ কি শুধু সাহাবীদের জন্যই নাযিল হয়েছিল? কুরআনের প্রতিশ্রুতি, সতর্কবাণী এবং সমস্ত বিধিনিষেধ যদি সাহাবীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয় তাহলে মেনে নিতে হবে যে, যারা পরবর্তীতে জন্মগ্রহণ করবে— কুরআন শরীফের সাথে তাদের আদৌ কোনো সম্পর্কই নেই। (عَمَّن نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ) (এমন অমূলক ধর্মবিশ্বাস হতে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। -অনুবাদক)

এছাড়া হাদীসে রয়েছে খিলাফত ত্রিশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে— একথা বলা কেমন অদ্ভুত বোধবুদ্ধির পরিচায়ক! যখনকিনা পবিত্র কুরআন বলছে,

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۝ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝

[অর্থাৎ (এরা হবে) প্রাথমিক যুগের লোকদের মাঝ থেকে এক বড়ো দল এবং পরবর্তী লোকদের মাঝ থেকেও এক বড়ো দল। (আল-ওয়াকিয়া: ৪০-৪১) -অনুবাদক।] অতএব এর বিপরীতে কোনো হাদীস উপস্থাপন করা এবং কুরআন বিরোধী অর্থ গ্রহণ করা জানি না কেমন জ্ঞানের পরিচয় বহন করে! হাদীসের বর্ণনায় বিশ্বাস থাকলে তো প্রথমে সেসব হাদীসের ওপর আমল করা উচিত যেগুলো শুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতার নিরিখে এই হাদীসের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। যেমন বুখারীর শরীফের সেসব হাদীস যেগুলিতে শেষ যুগের কতিপয় খলীফা সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সেই খলীফা যাঁর সম্পর্কে বুখারীতে লিখা রয়েছে, তাঁর সম্বন্ধে আকাশ থেকে আওয়াজ আসবে هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمُهْدِي [অর্থাৎ ইনি আল্লাহর খলীফা আল মাহদী -অনুবাদক]। এখন ভেবে দেখুন! এ হাদীসটি কত উচ্চ মান ও মর্যাদা সম্পন্ন হাদীস, যা এমন একটি হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে যা أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ [অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব -অনুবাদক]। কিন্তু আপত্তিকারী

মহোদয় যে হাদীসটি উপস্থাপন করেছেন, আলেমদের মতে তা বিভিন্নভাবে প্রশ্নবিদ্ধ এবং এর শুদ্ধতা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। শেষ যুগে কতিপয় খলীফার আবির্ভাবের সংবাদ কি আপত্তিকারী মহোদয় লক্ষ করেন নি, যেখানে বলা হয়েছে, হারেস বা জমিদার আসবে, মাহদী আসবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে খলীফা আসবে? এসব সংবাদ কি হাদীসে রয়েছে, নাকি অন্য কোনো গ্রন্থে? তিন যুগের কথা হাদীস থেকে প্রমাণিত। প্রথমে খিলাফতে রাশেদার যুগ, এরপর বক্রতার যুগ, যখন কষ্টদায়ক রাজবাদশারা রাজত্ব করবে, তারপর শেষ যুগ যা নবুওয়তের পদ্ধতিতে চলবে। এমনকি মহানবী (সা.) তো আরো বলেছেন, আমার উম্মতের প্রথম যুগ ও শেষ যুগ খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ হবে আর এই দুই যুগের উপমা সেই বারিধারার ন্যায় যা এমন কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ থাকবে যে, বলা কঠিন হবে এর প্রথমাংশে বেশি কল্যাণ নাকি শেষাংশে।

এখানে একথাও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نُزَلِّلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

অর্থাৎ আমরাই এ কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষণ করব (আল-হিজর: ১০)। এতে একথার ব্যাখ্যা রয়েছে যে, এই বাণী চিরঞ্জীব এবং সর্বদা এমন সব মানুষ জন্ম নিতে থাকবে, যারা এর শিক্ষাকে সজিবতা দান করবে আর মানুষকে এর কল্যাণে সিক্ত করতে থাকবে। কোনো জিনিসের উপকারিতার ওপরই এর প্রকৃত সংরক্ষণ নির্ভরশীল, তাই যদি প্রশ্ন ওঠে যে, কুরআনের কী উপকারিতা রয়েছে? তাহলে নিম্নের আয়াত থেকে এর কী কী লাভ তা বুঝা যায়—

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(আল-জুমুআ: ৩)

[অর্থাৎ তিনিই নিরক্ষরদের মাঝ থেকে তাদেরই একজনকে এক মহান রসূল করে আবির্ভূত করেছেন। সে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনায়, তাদের পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শেখায়।

—অনুবাদক]— এ আয়াতের সারকথা হলো, পবিত্র কুরআনের বড়ো বড়ো দুটি উপকারিতা রয়েছে আর তা পৌঁছে দিতেই মহানবী (সা.) এসেছিলেন। প্রথমটি হলো, কুরআনের হিকমত বা প্রজ্ঞা, অর্থাৎ কুরআনের গূঢ়তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি হলো, কুরআনের প্রভাব, যা আত্মশুদ্ধির কারণ। কুরআনের পাণ্ডুলিপি খুব যত্নসহকারে সংরক্ষণ করাই এর সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট নয়, কেননা ইতঃপূর্বে এমন কাজ তো ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরাও করেছে। এমনকি তারা তওরাতের বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত গণনা রেখেছিল; বরং এখানে তো আক্ষরিক হিফায়তের পাশাপাশি পবিত্র কুরআনের কল্যাণরাজি ও প্রভাব সুরক্ষা করাই মূল উদ্দেশ্য। আর বিভিন্ন সময়ে এমন সব নায়েবে রসূলরা আসলেই আল্লাহর সুনত বা রীতি অনুযায়ী এর সুরক্ষা সম্ভব, যাঁদের মাঝে প্রতিচ্ছায়ারূপে রিসালাত বা নবুওয়তের সমস্ত গুণাগুণ নিহিত থাকবে এবং যাঁদেরকে নবীদের প্রদত্ত সকল কল্যাণে ভূষিত করা হবে। এই মহান বিষয়ের প্রতিই নিম্নের আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

(আন-নূর: ৫৬)

[অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দেবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে তারাই দুষ্কৃতকারী। —অনুবাদক]

অতএব এ আয়াতটি মূলত দ্বিতীয় আয়াত—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

[অর্থাৎ নিশ্চয় আমরাই এ উপদেশবাণী (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করেছি

এবং নিশ্চয় আমরাই এর সুরক্ষাকারী। (আল-হিজর: ১০) -অনুবাদক]- এর ব্যাখ্যা প্রদান করছে এবং কীভাবে ও কোন পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন সংরক্ষিত হবে সে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বিভিন্ন সময় আমি মহানবী (সা.)-এর খলীফা বা প্রতিনিধি প্রেরণ করতে থাকব, যেভাবে অতীতে হয়েছে, ঠিক সেভাবেই তাঁরা নবীর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং তাঁর কল্যাণের অংশীদার হবেন- এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করতেই খলীফা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁদের হাতে ধর্মের উন্নতি হবে এবং ভয়ভীতির পর নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, অর্থাৎ তাঁরা এমন সময় আসবেন যখন ইসলাম বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত থাকবে। তাঁদের আগমনের পর যারা তাঁদের অবাধ্য হবে- তারাই সত্যিকার অর্থে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। এটিই হলো সেই প্রশ্নের উত্তর, যা কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোক উত্থাপন করে বলে, আমাদের জন্য কি ওলী-আউলিয়াদের মান্য করা আবশ্যিক? তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, নিঃসন্দেহে আবশ্যিক এবং তাঁদের যারা বিরোধিতা করে আর বিরোধী অবস্থায়ই মারা যায়, তারা পাপিষ্ঠ।

আপত্তিকারী মহোদয় এখানে একথাও লিখেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

[অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম (আল-মায়দা: ৪) -অনুবাদক] আর তিনি এরপর আপত্তি করেছেন, ধর্ম যেহেতু পূর্ণতা পেয়েছে আর নিয়ামতও পরিপূর্ণ হয়েছে, তাই এখন আর কোনো মুজাদ্দিদেরও প্রয়োজন নেই এবং নবীরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো! আপত্তিকারী মহোদয় এমন ধারণা পোষণের মাধ্যমে স্বয়ং কুরআনের ওপরই আপত্তি করেছে, কেননা কুরআন শরীফ এ উম্মতের মাঝে খলীফাদের বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যেমনটি এখনই উল্লেখ করা হয়েছে আর বলেছে, তাঁদের যুগে ধর্ম দৃঢ়তা লাভ করবে, অনিশ্চয়তা দূর হবে এবং ভয়ভীতির পর শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই ধর্ম পূর্ণতা লাভের পর কোনো ধরনের কার্যক্রমই যদি সঠিক না হয়, তবে আপত্তিকারীর কথা মতো ত্রিশ বছরের যে খিলাফত রয়েছে তাও মিথ্যা সাব্যস্ত হয়, কেননা ধর্ম যখন পূর্ণতা পেয়েছে

তখন অন্য আর কারো প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয়! অজ্ঞ প্রতিপক্ষ অন্যভাবে **اَيُّوْمَ الْكِيْنِ لَكُمْ دِيْنُكُمْ** [অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম –অনুবাদক]– আয়াতটি উপস্থাপন করেছে। আমরা কখন বলেছি, মুজাদ্দিদ ও মুহাদ্দাস পৃথিবীতে এসে ধর্মের মাঝে কিছুটা সংযোজন বা বিয়োজন করেন? বরং আমাদের বক্তব্য হলো, একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর যখন পবিত্র শিক্ষার ওপর কলুষিত ধ্যানধারণার এক ধূলি-আস্তরণ পড়ে এবং বিশুদ্ধ সত্যের চেহারা ঢাকা পড়ে, তখন সেই সুন্দর মুখ দেখানোর জন্যই মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দাস ও আধ্যাত্মিক খলীফারা এসে থাকেন। আল্লাহ্‌ই জানেন আপত্তিকারী বেচারার কোথা থেকে এবং কার কাছ থেকে শুনেছেন, মুজাদ্দিদ ও আধ্যাত্মিক খলীফারা পৃথিবীতে এসে ধর্মের কিছুটা পরিবর্তন ও রহিত করেন? না! তাঁরা ধর্মকে মনসুখ বা রহিত করতে আসেন না; বরং ধর্মের দ্যুতি ও উজ্জ্বলতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই আসেন। আপত্তিকারী মহোদয় মনে করেন, তাঁদের প্রয়োজনইবা কী? এমন ধারণা সৃষ্টি হবার মূল কারণ, ধর্মের বিষয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই আর কখনো প্রণিধানও করেন নি যে– ইসলাম কী জিনিস, ইসলামের উন্নতি কাকে বলে, সত্যিকার উন্নতি কীভাবে ও কোন পন্থায় সাধিত হওয়া সম্ভব এবং কী অবস্থায় কাউকে বলা যায় যে, সে খাঁটি মুসলমান? আপত্তিকারী মহোদয় যে বিষয়কে যথেষ্ট মনে করেন তা হলো– কুরআন আছে, আলেম সম্প্রদায় আছে এবং অধিকাংশ মানুষের হৃদয় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ইসলাম অভিमुखে ধাবমান, কাজেই কোনো মুজাদ্দিদের আর প্রয়োজন কী? কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো! আপত্তিকারী মহোদয়ের জানা নেই, এই উম্মতের মাঝে মুজাদ্দিদ ও আধ্যাত্মিক খলীফাদের ঠিক সেভাবেই প্রয়োজন, যেভাবে প্রাচীনকাল থেকে নবীদের প্রয়োজনীয়তা চলে আসছে। কেউ একে অস্বীকার করতে পারে না যে, হযরত মূসা (আ.) নবী ছিলেন, প্রেরিত ছিলেন এবং তাঁর তওরাত বনী ইসরাঈলের শিক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ ছিল। যেভাবে পবিত্র কুরআনে এই আয়াত **اَيُّوْمَ الْكِيْنِ لَكُمْ دِيْنُكُمْ** [অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য পূর্ণ করলাম –অনুবাদক] রয়েছে সেভাবে তওরাতেও এমন আয়াত রয়েছে যার অর্থ, বনী ইসরাঈলকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও জালালী তথা মহিমাম্বিত কিতাব দেওয়া হয়েছে– যার নাম তওরাত। এছাড়া কুরআন শরীফেও তওরাতের এ পরিচয়ই বিদ্যমান। তথাপি তওরাতের পর শত শত এমন নবী বনী ইসরাঈলে এসেছেন যাঁদের সাথে নতুন কোনো কিতাব ছিল

না; বরং সেসব নবীর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁদের সমসাময়িক যুগের সব মানুষ যারা তওরাতের শিক্ষা হতে বিচ্যুত হয়েছে তাদের তওরাতের মূল শিক্ষার প্রতি পুনরায় ফিরিয়ে আনা এবং যাদের মনে কিছুটা সন্দেহ, নাস্তিকতা ও অবিশ্বাস জন্মেছে তাদেরকে পুনরায় সতেজ ঈমান দান করা। পবিত্র কুরআনে মহাপ্রতাপাশ্বিত আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

[অর্থ: আর নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূল প্রেরণ করেছি (আল-বাকারা: ৮৮) -অনুবাদক] অর্থাৎ মূসাকে আমরা তওরাত দিয়েছি এবং এ কিতাবের পর আমরা বহু নবী প্রেরণ করেছি, যেন তাঁরা তওরাতের সমর্থন ও সত্যয়ন করেন। একইভাবে অন্যত্র বলেন,

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا

[অর্থ: এরপর একের পর এক আমরা আমাদের রসূল পাঠিয়েছিলাম। (আল-মুমিনুন: ৪৫) -অনুবাদক] অর্থাৎ পরবর্তীতে একাধারে আমরা আমাদের রসূল প্রেরণ করেছি। সুতরাং এসব আয়াত থেকে প্রমাণ হয়, আল্লাহ তাঁলার রীতি হলো, তিনি তাঁর কিতাব প্রেরণের পর এর সমর্থন ও সত্যয়নের জন্য অবশ্যই নবীদের প্রেরণ করে থাকেন। যেমন তওরাতের সমর্থনে একই সময়ে চার শত নবী এসেছেন, যাঁদের আগমনের বিষয়ে আজ অবধি বাইবেল সাক্ষ্য বহন করছে।

এতো অধিক সংখ্যক রসূল প্রেরণের মূল রহস্য হলো, আল্লাহ তাঁলার এ অঙ্গীকারকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যে, এরপরও তাঁর সত্য কিতাব অঙ্গীকার করলে এর শাস্তি হবে স্থায়ী জাহান্নাম। যেমনটি তিনি বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(আল-বাকারা: ৪০)

অর্থাৎ যে-সব লোক কাকের হয়েছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা জাহান্নামী আর সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।

এখন যেহেতু ঐশীকিতাব অঙ্গীকারের শাস্তি এমন কঠোর ছিল, অন্যদিকে নবুওয়ত ও ঐশী ওহীর বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম; বরং স্বয়ং আল্লাহ তাঁলার সত্তাও

এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে, মানবচক্ষু ঐশী আলোতে আলোকিত হওয়া ছাড়া কোনোক্রমেই সেই সত্তার সঠিক ও পবিত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না— তাঁর রসূলদের কিতাবের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা তো পরের বিষয়। কাজেই আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়াত অন্ধ ও দৃষ্টিহীন মানুষকে ব্যাপক সাহায্য করতে চাইল। তাই শুধু একথাকে যথেষ্ট মনে করেন নি যে, একবার এক রসূল ও একটি কিতাব প্রেরণের পর সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এমন সব আকীদা বা বিশ্বাসকে শুধু অস্বীকার করার কারণেই অস্বীকারকারীদের স্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষেপের করা হবে, অথচ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পবিত্র ও উত্তম এ কথার চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে হতো না। প্রকৃতপক্ষে চিন্তাশীলদের জন্য এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, সেই খোদা যাঁর নাম রহমান তথা অযাচিত অসীমদাতা ও রহীম তথা বার বার কৃপাকারী, তিনি বিভিন্ন দেশের অধিবাসী এমন লোকদের কাছে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপিত হবার পূর্বেই কীভাবে এতো বড়ো শাস্তি দেবার জন্য স্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে আইন করতে পারেন— যারা শত শত বছর পর কুরআন ও রসূল (সা.)-এর নাম শুনেছে! তারা আরবীও বুঝে না এবং পবিত্র কুরআনের গুণাবলিও দেখতে পায় নি? কোনো মানুষের বিবেক কি একথা মেনে নিতে পারে যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ তা'লার কিতাব, তার কাছে এটি প্রমাণ হবার পূর্বেই তার গলায় ছুরি চালানো হবে? অতএব এ জন্যই আল্লাহ্ তা'লা স্থায়ীভাবে খলীফা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেন তাঁরা প্রতিচ্ছায়ারূপে নবুওয়তের জ্যোতি লাভ করে বিশ্ববাসীকে এর সাথে সম্পৃক্ত করেন এবং পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য ও এর পবিত্র কল্যাণরাজি মানুষকে প্রদর্শন করেন। আরো স্মরণ রাখতে হবে যে, যুগভেদে যুক্তিপ্রমাণের পূর্ণতাও ভিন্ন ভিন্নভাবে হয়ে থাকে। এছাড়া যুগের মুজাদ্দের সেই ক্ষমতা, যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বসহ আগমন করেন, কেননা সমকালীন ফেতনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলার সমাধান সেসব শ্রেষ্ঠত্বের মাঝে নিহিত থাকে। অতএব সর্বদা আল্লাহ্ তা'লা এরূপই করে যাবেন, যতদিন তিনি চাইবেন, অর্থাৎ পৃথিবীতে হিদায়াত ও সংশোধনের নিদর্শন স্থায়ীভাবে বিরাজমান থাকবে। আর এসব কথা প্রমাণহীন নয়; বরং নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তই এর সাক্ষী। বিভিন্ন দেশের নবী, রসূল ও মুহাদ্দাসদের বাদ দিয়ে যদি শুধু বনী ইসরাঈলের নবী, রসূল ও মুহাদ্দাসদের প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হয়, তাহলে তাদের কিতাবসমূহ দেখলে বুঝা যায়, চৌদ্দশত (১৪০০) বছরে, অর্থাৎ হযরত মুসা

(আ.) হতে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত হাজারো নবী ও মুহাদ্দাস তাদের মাঝে জন্ম নিয়েছেন, যারা নিষ্ঠাবান সেবকের ন্যায় তওরাতের সেবায় রত ছিলেন। পবিত্র কুরআন ও বাইবেল এসব কথার সাক্ষ্য বহন করছে। আর সেই নবীরা নতুন কোনো কিতাব বা ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আসতেন না এবং নতুন কোনো ধর্মও শেখাতেন না, তাঁরা কেবল তওরাতের সেবক ছিলেন; বরং বনী ইসরাঈলের মাঝে যখন নাস্তিকতা, বেইমানী, কুপ্রথা ও পাষণ্ডতা ছড়িয়ে পড়ত, তখন তাঁরা আবির্ভূত হতেন। এখন কোনো চিন্তাশীল মানুষ ভেবে দেখুক! যেখানে মূসা (আ.)-এর এমন একটি সীমাবদ্ধ শরীয়তের জন্য আল্লাহ্ তা'লা এতটা সাবধানতা অবলম্বন করেছেন যে, একে সতেজ রাখতে হাজারো নবী প্রেরণ করেছেন; অথচ সেই শরীয়ত পৃথিবীর সকল জাতির জন্যেও ছিল না আর এর আঁচল কিয়ামত পর্যন্তও বিস্তৃত ছিল না। বার বার আগত এসব নবী এমন নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, মনে হয় যেন বনী ইসরাঈল খোদাকে নবরূপে দেখে নিয়েছে। অতএব এ উম্মত, যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয় এবং যারা সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.)-এর আঁচল ধরে আছে তাদের কীভাবে এমন হতভাগা মনে করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কেবল ত্রিশ বছরই কৃপাদৃষ্টি দিয়ে এবং ঐশীনের দেখিয়ে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। নিজেদের নবী (সা.)-এর সাথে বিচ্ছেদের পর এ উম্মত শত শত বছর পার করেছে, হাজারো ধরনের ফিতনার সম্মুখীন হয়েছে, বড়ো বড়ো ভূমিকম্পের কবলে পড়েছে, তাদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের দাজ্জালিয়াত তথা ধোঁকাবাজি ছড়িয়ে পড়েছে, একটি জনগোষ্ঠী সুদৃঢ় এ ধর্মের ওপর আক্রমণ করেছে, সমস্ত কল্যাণ ও অলৌকিক নিদর্শনাবলি অস্বীকার করা হয়েছে, খোদার প্রিয়ভাজনকে অপ্রিয় গণ্য করা হয়েছে, কিন্তু তবুও আল্লাহ্ তা'লা এ উম্মতের দিকে চোখ তুলে তাকান নি এবং তাদের প্রতি তাঁর কখনো দয়ারও উদ্রেক হয় নি। এছাড়া কখনোই তাঁর মনে পড়ে নি, এরাও তো বনী ইসরাঈলের মতোই দুর্বল মানুষ এবং ইহুদীদের মতোই এদের গাছগুলোও সর্বদা ঐশী সৈঁচের মুখাপেক্ষী। সেই দয়াময় খোদার পক্ষ থেকে কি এমনটি হতে পারে, যিনি মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছিলেন— চিরতরে ফিতনা-ফ্যাসাদ দূর করতে? আমরা কি একথা ভাবতে পারি যে, পূর্বের উম্মতের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার করুণা ছিল, তাই তিনি তওরাত প্রেরণের পর এর সাহায্য ও সমর্থন করেছেন এবং হৃদয়গুলোকে বার বার সঞ্জীবিত করতে হাজারো রসূল ও মুহাদ্দাস প্রেরণ করেছেন; কিন্তু এ

উম্মত অভিশপ্ত ছিল, কাজেই তিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করে পূর্বের সবকথা ভুলে গেছেন আর আলেম সমাজকে চিরতরে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা ও বিবেকবুদ্ধির হাতে ছেড়ে দিয়েছেন? অথচ হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে তো স্পষ্ট বলেছেন,

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۝ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

(আন-নিসা: ১৬৫-১৬৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা মূসার সাথে বাক্যালাপ করেছেন এবং তার সমর্থন ও সত্যনের জন্য এমনসব রসূল প্রেরণ করেছেন, যারা মুবাস্থের তথা সুসংবাদদাতা ও মুনযির তথা সতর্ককারী ছিলেন, যেন মানুষের কাছে কোনো ধরনের অজুহাত না থাকে আর তারা যেন নবীদের চলমান ধারা দেখে পরম নিষ্ঠার সাথে তওরাতের প্রতি ঈমান আনে। তিনি আরো বলেছেন,

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

অর্থাৎ আমরা অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তোমার কাছে আমরা কতকের কথা উল্লেখ করলেও এমন অনেকেই আছে, যাদের কথা উল্লেখই করি নি। (আন-নিসা: ১৬৫)। কিন্তু ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের জন্য সেই ব্যবস্থা করেন নি। (অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়) যেন হযরত মূসা (আ.)-এর জাতির প্রতি আল্লাহর যে অনুগ্রহ ও কৃপা ছিল তা এই উম্মতের প্রতি নেই। এটি সুস্পষ্ট যে, দীর্ঘ যুগের অবসানে অতীতের ঐশী নিদর্শন ও কেরামতসমূহ সর্বদাই কল্পকাহিনিতে পরিণত হয় এবং নিজ জাতিকে সব ধরনের অলৌকিক নিদর্শন থেকে বঞ্চিত দেখে পরবর্তী প্রজন্ম শেষ পর্যন্ত অতীতের ঐশী নিদর্শনাবলি সম্পর্কে সন্দেহে নিপতিত হয়। এছাড়াও চোখের সামনে যেভাবে বনী ইসরাঈলের হাজারো নবীর দৃষ্টান্ত রয়েছে এর ফলে এ উম্মতের মাঝে আরো বেশি উদাসীনতা সৃষ্টি হবে এবং নিজেদের অভাগা পেয়ে বনী ইসরাঈলকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখবে অথবা কুধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের বাস্তব ঘটনাগুলোকেও শুধু রূপকথার গল্প মনে করবে। আর বলা হয়, ইতঃপূর্বে হাজারো নবী এসেছেন এবং ঐশী নিদর্শনও ব্যাপকহারে প্রদর্শিত হয়েছে, কাজেই, এ উম্মতের জন্য অলৌকিক নিদর্শন, কেরামত ও ঐশী কল্যাণরাজির

কোনো প্রয়োজন ছিল না, তাই আল্লাহ তা'লা তাদের এসব বিষয় হতে বঞ্চিত রেখেছেন। এমন কথা শুধু তাদের মুখ থেকেই নিসৃত হওয়া সম্ভব, যারা ঈমানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়। অন্যথায় মানুষ খুবই দুর্বল এবং সর্বদাই ঈমানের দৃঢ়তার মুখাপেক্ষী, এ বিষয়ে তাদের মনগড়া যুক্তিপ্রমাণ আদৌ কোনো কাজে আসতে পারে না, যতক্ষণ না তারা নতুনভাবে উপলব্ধি করবে, 'আল্লাহ আছেন'। তবে হ্যাঁ! একথা সত্য যে, অলীক ঈমান পাপ থেকে বিরত রাখতে না পারলেও শাস্ত্রীয় এবং যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে। এখানে আরো স্মরণ রাখতে হবে, ধর্ম পরিপূর্ণ হবার অবধারিত অর্থ এই নয় যে, ধর্মের যথাযথ সুরক্ষার ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি একটি গৃহ নির্মাণ করে এবং এর সবগুলো কক্ষ যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করে ও ভবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে-সব প্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে, এর সবই উত্তমরূপে সমাধা করে আর এর কিছুকাল পর ধুলিবাড় ও বৃষ্টিপাত হয় এবং সেই গৃহের কারুকাজের ওপর ধুলোবালির আবরণ পরে এর সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে যায় আর এরপর যদি তার কোনো উত্তরাধিকারী সেই ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চায়, কিন্তু তখন যদি তাকে একথা বলে নিষেধ করা হয় যে, গৃহ নির্মাণ তো সম্পন্ন হয়ে গেছে [এখন পরিচ্ছন্নতার আর কী প্রয়োজন? -অনুবাদক] তবে এমন নিষেধাজ্ঞা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। পরিতাপের বিষয় হলো! এ ধরনের আপত্তিকারীরা ভেবে দেখে না যে, কোনো কিছুই পূর্ণতা এক জিনিস আর নির্মিত একটি পূর্ণ ভবনকে বিভিন্ন সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা অন্য জিনিস। স্মরণ রাখতে হবে যে, মুজাদ্দিদেরা ধর্মের মাঝে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করেন না। তবে হ্যাঁ! বিলুপ্ত ধর্মকে পুনরায় মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। আর মুজাদ্দিদের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যিক নয়— এমন কথা বলা আল্লাহ তা'লার আদেশের সুস্পষ্ট অবাধ্যতা, কেননা তিনি বলেন,

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

অর্থাৎ খলীফা প্রেরণের পর যে ব্যক্তি তাঁদের অস্বীকার করবে সে পাপীদের দলভুক্ত হবে। (আন-নূর: ৫৬)

এখন নিম্নে আমরা এসব আলোচনার সারকথা সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি আর তা হলো, নিম্নলিখিত যুক্তিপ্রমাণ থেকে প্রমাণিত হয়, রসূলুল্লাহ (সা.)-

এর তিরোধানের পর ফিতনা-ফ্যাসাদ তথা বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের যুগে এ উন্মত্তের মাঝে অব্যাহতভাবে এমন সব সংস্কারকের আগমন অত্যাৱশ্যক যাঁদের ওপর নবীদের অনেকগুলো কাজের মধ্যে থেকে একটি কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আর তা হলো, তাঁরা যেন মানুষকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করেন, ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে এমন সব বিদাত দূর করেন, ঐশী আলো লাভ করে ধর্মের সত্যতার সকল দিক মানুষের সামনে তুলে ধরেন এবং নিজেদের পবিত্র আদর্শের মাধ্যমে লোকদেরকে সততা, ভালোবাসা ও পবিত্রতার প্রতি আকৃষ্ট করেন। আর সেই যুক্তিপ্রমাণগুলো হলো,

প্রথমত, বিবেক এ বিষয়কে আবশ্যিক জ্ঞান করে যে, যেহেতু ধর্ম ও পরকাল-সংক্রান্ত বিষয়গুলো অতীব সূক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক বিষয়, যেমন- সমস্ত অদৃশ্য ও চিন্তার অতীত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হয়। কেউ কখনো আল্লাহ্ তা'লাকে দেখে নি, জান্নাত দেখে নি, জাহান্নামও পরিদর্শন করে নি আর ফেরেশতার সাথেও সাক্ষাৎ হয় নি। এছাড়া ঐশী বিধিনিষেধ মানবপ্রবৃত্তি বিরোধী এবং নফসে আন্মারা তথা অবাধ্য প্রবৃত্তি যে-সব বিষয়ে আনন্দ পায় ঐশী বিধিনিষেধ সেগুলোকে বারণ করে। অতএব বিবেকসম্মতভাবে এ বিষয়টি শুধু অনুগ্রহ নয়; বরং আবশ্যকীয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র নবী, যিনি শরীয়ত ও কিতাব নিয়ে আগমন করেন, তিনি নিজ সত্তায় শক্তিশালী প্রভাব ও পবিত্রকরণ শক্তি রাখেন, হয় তিনি যেন এক সুদীর্ঘ জীবন নিয়ে আসেন এবং সর্বদা ও প্রত্যেক শতাব্দীতে আগত তাঁর প্রতিটি নতুন উন্মত্তকে নিজ সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্যে ভূষিত করেন আর তাদেরকে নিজের অধীনে ও স্বীয় কল্যাণময় ডানার আশ্রয়ে রেখে সেই কল্যাণ, নূর ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান দান করেন, যা তিনি (তাঁর নবুওয়তের) প্রাথমিক যুগে দান করেছিলেন আর না হয় প্রত্যেক ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে অবশ্যই তাঁর এমন সব উত্তরাধিকারীর জন্ম নেওয়া উচিত, যারা তাদের গুণাগুণ নিজেদের মাঝে পূর্ণরূপে ধারণ করে, ঐশী কিতাবের সূক্ষ্মতা ও তত্ত্বজ্ঞান ওহী-এলহামের মাধ্যমে বর্ণনা করতে পারে, মৌখিক বক্তব্যকে প্রমাণিত সত্যরূপে উপস্থাপন করতে পারে এবং সত্যাস্থেয়ীদের দৃঢ়বিশ্বাসের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারে, যাতে এমন মানুষ যারা সন্দেহ ও ভুলভ্রান্তির শিকার, তারা তাদের প্রকৃত কল্যাণ হতে বঞ্চিত না হয়। কেননা একথা খুবই স্পষ্ট যে, যখন কোনো নবীর যুগ সমাপ্ত হবার দ্বারপ্রান্তে থাকে এবং এর আশিস প্রত্যক্ষকারীরা মারা যায়, তখন

প্রত্যক্ষ বিষয়গুলো লিখিতবিবরণে রূপ নেয় বা কিতাবের অংশ হয়ে যায়। এরপর দ্বিতীয় শতাব্দীর মানুষের দৃষ্টিতে এই নবীর নৈতিক চরিত্র এবং তাঁর ইবাদত, ধৈর্য, দৃঢ়তা, সততা, পবিত্রতা, বিশ্বস্ততা, সমস্ত ঐশীসাহায্য ও সমর্থন, অলৌকিক নিদর্শন এবং মুজিয়া যা তাঁর নবুওয়তের যথার্থতা ও দাবির সত্যতার স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হতো তা নতুন শতাব্দীর মানুষের কাছে কিছুটা কল্পকাহিনি বলে মনে হয় আর এ কারণেই সেই ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ও আনুগত্যের প্রেরণা যা নবীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মানুষের মাঝে পাওয়া যায়, তা অন্যদের মাঝে পাওয়া যায় না। আর এটি সুস্পষ্ট যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীরা যে ঈমানী নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন আর নিজেদের ধনসম্পদ, জীবন এবং মানসম্মানকে যেভাবে ইসলামের সেবায় আন্তরিকতার সাথে উৎসর্গ করে গেছেন, এর দৃষ্টান্ত অন্য শতাব্দীতে তো দূরের কথা স্বয়ং দ্বিতীয় শতাব্দীর মানুষ, অর্থাৎ তাবেঈনদের মাঝেই দেখা যায় নি- এর কারণ কী? এর মূল কারণ হলো, সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম সেই মহাসত্যবাদী বীরের মুখ দেখেছিলেন, কুরাইশ কাফিরদের মুখ থেকেও যাঁর খোদাভক্তির সাম্রাজ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়েছে এবং তাঁর নিত্যদিনের প্রার্থনা, ভক্তিপূর্ণ সিজদা, আনুগত্যে বিলীন অবস্থা, পরম ভালোবাসা, প্রেমাস্পদের মুখে উজ্জ্বল চিহ্নাবলি আর সেই পবিত্র মুখমণ্ডলে ঐশীজ্যোতি দেখে (কাফিররা) বলত, عَشِقُ مُحَمَّدٌ عَلَى رَبِّهِ অর্থাৎ ‘মুহাম্মদ তাঁর প্রভুর প্রেমে বিভোর’। এছাড়া সাহাবী (রা.)-রা শুধু সেই সততা, ভালোবাসা ও নিষ্ঠাই দেখেন নি; বরং আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয় থেকে উদ্ভাবিত সমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গায়িত ভালোবাসার বিপরীতে যখন তাঁরা অলৌকিক সাহায্য ও সমর্থনরূপে আল্লাহ তাঁলার প্রেমের বিকাশও প্রত্যক্ষ করেছেন, তখন বুঝতে পেরেছেন, আল্লাহ আছেন আর তাঁদের হৃদয় বলে উঠেছে- সেই আল্লাহ এই বীরের সাথে আছেন। তাঁরা এত বেশি ঐশীবিষ্ময় দেখেছেন এবং এত বেশি ঐশী নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন যে, এ বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না যে, আসলেই এক সর্বোচ্চ সত্তা আছেন, যাঁর নাম আল্লাহ এবং সবকিছু তাঁরই শক্তিমত্তার অধীন আর যাঁর পক্ষে কোনো কাজই অসম্ভব নয়। এজন্যই তাঁরা এমন সততা ও নিষ্ঠার সাথে সেই কর্ম সম্পাদন করে দেখিয়েছেন এবং সেই আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা মানুষ কখনোই করতে পারে না যতক্ষণ না তাঁদের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহের অবসান ঘটে আর তারা স্বচক্ষে দেখে নেয়, সেই

পবিত্র সত্তা এতেই সন্তুষ্ট যে, মানুষ যেন ইসলাম গ্রহণ করে এবং মনপ্রাণ দিয়ে তাঁর প্রিয় রসূল (সা.)-এর আনুগত্য স্বীকার করে। তখন এ হাক্কুল ইয়াকীন বা নিশ্চিত বিশ্বাসের পর তাঁরা যতটুকু আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন, আনুগত্যের চেতনায় যে-সব কাজ করেছেন এবং নিজেদের জীবন তাদের মনোনীত পথপ্রদর্শকের সম্মুখে যেভাবে উৎসর্গ করেছেন তা অর্জন করা মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সেই বসন্তের দৃশ্য তার দৃষ্টিপটে থাকে, যা সাহাবা (রা.)-এর যুগে এসেছিল। এসব উপকরণ ও মাধ্যম ব্যতীত যেহেতু একরূপ পূর্ণতা অসম্ভব এবং সেই সকল শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া যেহেতু নিশ্চিতরূপে মুক্তি লাভও অসম্ভব; তাই আবশ্যিক বিষয় হলো, প্রতিটি মানুষকে মুক্তির দিকে আহ্বানকারী সেই দয়ালু খোদা যেন প্রত্যেক শতাব্দীতেই এমন ব্যবস্থা রাখেন, যাতে করে তাঁর বান্দারা কোনো কালেই হাক্কুল ইয়াকীন বা নিশ্চিত বিশ্বাসের মর্যাদা হতে বঞ্চিত না থাকে।

কুরআন ও হাদীসই তো আমাদের জন্য যথেষ্ট, সৎসঙ্গের কোনো প্রয়োজন নেই— একথা বলা স্বয়ং কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থি, কেননা মহাপ্রতাপাশ্বিত আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন,

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

[অর্থাৎ এবং সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করো। (আত-তাওবা: ১১৯) —অনুবাদক] আর সত্যবাদী হলেন তাঁরা— যাঁরা অন্তরদৃষ্টির মাধ্যমে সত্যকে চিনেছেন এবং এর ওপর মনেপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ঐশীসাহায্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হাক্কুল ইয়াকীন বা নিশ্চিত বিশ্বাসে অধিষ্ঠিত হওয়া ব্যতীত এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত সাদেক বা সত্যবাদী হলেন— নবী, রসূল, মুহাদ্দাস এবং কামিল ওলী-আউলিয়ারা, যাঁদের ওপর ঐশীজ্যোতির প্রতিফলন ঘটেছে আর যাঁরা এ পৃথিবীতেই আল্লাহ্ তা'লাকে দৃঢ়বিশ্বাসের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর উল্লিখিত আয়াতটি ইঙ্গিতস্বরূপ ঘোষণা করছে, কখনোই এ পৃথিবী সত্যবাদীশূন্য থাকে না, কেননা **وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** [অর্থাৎ তোমরা সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করো —অনুবাদক] মর্মে চিরস্থায়ী আদেশ অনুযায়ী স্থায়ীভাবে সত্যবাদীর অস্তিত্ব থাকা একান্ত আবশ্যিক।

এছাড়া অভিজ্ঞতাও সুস্পষ্টভাবে বলে, যে-সব লোক সৎসঙ্গের বিষয়ে

উদাসীন জীবনযাপন করে তাদের জ্ঞান ও কৌশল তাদের শারীরিক কামনা-বাসনা হতে কখনোই পরিশুদ্ধ করতে পারে না এবং আল্লাহ্ তা'লা আছেন, একথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা ইসলামের সর্বনিম্ন স্তর- এ পদমর্যাদাও তাদের কোনোক্রমেই অর্জিত হতে পারে না। তারা তাদের সিন্দুকে গচ্ছিত সম্পদের প্রতি অথবা নিজেদের দখলে থাকা গৃহের প্রতি যেভাবে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করে, সেভাবে কখনোই তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। তারা আর্সেনিক খেতে ভয় পায়, কেননা তারা নিশ্চিতভাবে জানে, এটি এক ধরনের প্রাণঘাতী বিষ, কিন্তু পানের বিষকে ভয় পায় না, যদিও তারা প্রতিদিনই কুরআনে পড়ে-

إِنَّ مِّنْ يُأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

(তাহা: ৭৫)

[অর্থাৎ নিশ্চয় যে তার প্রতিপালক-প্রভুর কাছে অপরাধীরূপে আসবে তার জন্য অবশ্যই রয়েছে জাহান্নাম। এতে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না। -অনুবাদক] অতএব সত্য কথা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লাকে চেনে না সে কুরআন শরীফও অনুধাবন করতে পারে না। তবে হ্যাঁ! একথাও সত্য যে, পবিত্র কুরআন হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু কুরআন শরীফের হিদায়াত সেই ব্যক্তির অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত যাঁ ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে অথবা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত আখ্যায়িত হয়েছেন। পবিত্র কুরআন যদি এককভাবেই যথেষ্ট হতো, তাহলে তো আল্লাহ্ তা'লা বৃক্ষরাজির পাতায় প্রাকৃতিকভাবে কুরআন লিখতে বা আকাশ হতে লিখিত কুরআন অবতীর্ণ করতে পূর্ণক্ষমতাবান ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এমনটি করেন নি; বরং পৃথিবীতে কুরআন শরীফের শিক্ষক প্রেরণ না করা পর্যন্ত কুরআন অবতীর্ণ করেন নি। কুরআন শরীফ খুলে দেখুন! কত স্থানে এ বিষয়ক আয়াত রয়েছে, **يُحْيِيهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** অর্থাৎ সেই মহান নবী (সা.) মানুষকে কুরআন ও কুরআনে বিধৃত প্রজ্ঞা শেখান। (আল-জুমুআ: ৩); অন্যত্র বলেছেন, **لَا يَسْأَلُ رِأْسًا مِّنْهُمْ** অর্থাৎ যাদেরকে পবিত্র করা হয়েছে কেবল তাদের কাছেই পবিত্র কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্মতা প্রকাশ করা হয়। (আল-ওয়াকিয়া: ৮০)। অতএব এ সব আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়, কুরআন বোঝার জন্য এমন একজন শিক্ষক প্রয়োজন, যাকে আল্লাহ্ তা'লা

স্বহস্তে পবিত্র করেছেন। কুরআন শেখার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন না থাকলে প্রাথমিক যুগেও এর প্রয়োজন ছিল না। আর একথা বলা যে, প্রাথমিক যুগে তো কুরআন শরীফের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যখন সমাধান হয়ে গেছে তখন আর প্রয়োজন কী? এর উত্তর হলো, সমাধানকৃত বিষয়ও একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর পুনরায় সমাধানযোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়, এছাড়াও উন্মত্ত তো প্রত্যেক যুগেই নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়। পবিত্র কুরআন সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার, এতে কোনো সন্দেহ নেই, তাই বলে একই যুগে এর সমস্ত জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো আবশ্যিক নয়; বরং সমস্যার সম্মুখীন হলেই সে অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞান প্রকাশিত হয় আর প্রত্যেক যুগের সমস্যার ধরন অনুযায়ী সেসব সমস্যার সমাধানকারী আধ্যাত্মিক শিক্ষক প্রেরিত হন, যাঁরা রসূলগণের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন এবং প্রতিচ্ছায়ারূপে রসূলগণের উৎকর্ষ লাভ করে থাকেন আর যে মুজাদ্দিদের কার্যক্রম যে রসূলের কার্যক্রমের সাথে খুব বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, আল্লাহ তা'লার দরবারে তাঁকে সেই রসূলের নামে ডাকা হয়।

কুরআনী শিক্ষার কিছু অংশ শুধু অবস্থা বা পরিস্থিতির বিবরণ নয়, এ কারণেও নতুন শিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দেয়। সর্বপ্রথম শিক্ষক এবং এ সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজ সাহাবীদের (রা.) যুগের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী কুরআনের সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিয়েছেন। যেভাবে আল্লাহ তা'লা বলেন, আমি আলিমুল গাইব [অর্থাৎ অদৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত—অনুবাদক], আমি আহ্লানে সাড়া দেই, আমি সর্বশক্তিমান, আমি দোয়াসমূহ কবুল করি, সত্যাস্থেষীদের প্রকৃত আলো পর্যন্ত পৌঁছে দেই, আমি আমার সাদেক বা সত্যবাদী বান্দাদের প্রতি এলহাম করি এবং আমার বান্দাদের মধ্যে আমি যাকে পছন্দ করি তার মাঝে আমার রূহ ফুঁকে দেই। এসব বিষয় এমন যে, শিক্ষক নিজে এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন না করা পর্যন্ত কোনোক্রমেই তা বোধগম্য হতে পারে না। অতএব বলা বাহুল্য যে, শুধু বাহ্যিক (জ্ঞানে জ্ঞানী) আলেমরা নিজেরাই অন্ধ, তাই তারা এ সব শিক্ষা বুঝাতে সক্ষম নয়। প্রকৃত কথা হলো, তারা তাদের শিষ্যদের ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সর্বদাই কুধারণা দিয়ে থাকে এবং বলে, এসব বিষয় অতীতে ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে হওয়া সম্ভব নয়। তাদের কথা শুনে মনে হয়, ইসলাম যেন এখন আর জীবন্ত ধর্ম নয় আর এর প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হবার কোনো পথ এখন আর খোলা নেই। কিন্তু

একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'লা যদি কুরআন শরীফের বারনাধারা হতে তাঁর সৃষ্টি মানুষকে চিরকাল পানি পান করানোর ইচ্ছা ব্যক্ত থাকেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর সেসব প্রাচীন নিয়মনীতি স্মরণ রাখবেন, যার প্রচলন তিনি আদিকাল থেকে করে এসেছেন। কুরআনের শিক্ষা যদি একজন বিজ্ঞ ও সূক্ষ্ম চিন্তাশীল দার্শনিকের শিক্ষার ন্যায় সীমাবদ্ধ হয় এবং তাতে যদি এমন ঐশীশিক্ষা না থাকে, যা শুধু হাল বা বিশেষ আধ্যাত্মিক মর্যাদার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝানো যায় তবে তো نَعُوْذُ بِاللّٰهِ (আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি) কুরআনের অবতরণই বৃথা সাব্যস্ত হয়। কিন্তু আমি জানি, কেউ যদি ক্ষণিকের তরেও এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখে যে, নবীদের শিক্ষা ও দার্শনিকদের শিক্ষার মধ্যে শুদ্ধতা ও শিক্ষার সঠিক হবার দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য কী? তাহলে সে এছাড়া আর কোনো পার্থক্য পাবে না যে, নবীদের শিক্ষার অনেকটা অংশ সাধারণ জ্ঞানের উর্ধ্বে যা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনোভাবেই বুঝা যায় না। বিশেষ আধ্যাত্মিক মর্যাদার লোকেরাই কেবল তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এ বিষয়গুলোর কথা বলা যায় যেমন, ফেরেশতারা এভাবে রুহ কবয় করে ও এভাবে আকাশে নিয়ে যায় এবং কবরে এভাবে হিসাবনিকাশ হয় আর জান্নাত এমন, জাহান্নাম এমন, পুলসিরাত এমন, চারজন ফেরেশতা আল্লাহ তা'লার আরশ বহন করছে, কিয়ামতকে বহন করবে আটজন এবং আল্লাহ তা'লা তাঁর বান্দার প্রতি এভাবে ওহী নাযিল করেন অথবা তাদের নিকট দিব্যদর্শনের দ্বার খুলে দেন— এ সবই বিশেষ আধ্যাত্মিক মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষা এবং এগুলো শুধু মুখের কথায় বোধগম্য হয় না। অবস্থাই যেহেতু এমন, তাই পুনরায় আমি বলছি, মহাপ্রতাপাশ্বিত আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদের জন্য কুরআনী শিক্ষার এ অংশকে প্রাথমিক যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ না রাখার ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন, তাহলে তিনি (কুরআনী) শিক্ষার এ অংশের জন্য সর্বদাই শিক্ষক আনার ব্যবস্থাও করে থাকবেন— এতে কোনো সন্দেহ নেই, কেননা শিক্ষার আধ্যাত্মিক অংশ সেসব শিক্ষকের উপস্থিতি ছাড়া বোধগম্য হতে পারে না, যারা বিশেষ আধ্যাত্মিক মার্গে উপনীত। জগতের মানুষ তো ছোটো ছোটো বিষয়েও হেঁচট খায়। অতএব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর ইসলামে যদি এ ধরনের শিক্ষক না আসেন, যার মাঝে প্রতিচ্ছায়াক্রমে নবুওয়তের নূর বা জ্যোতি থাকে, তাহলে তো মনে হবে, আল্লাহ তা'লা ইচ্ছাকৃতভাবে কুরআনকে ব্যর্থ করেছেন, কেননা

যাঁরা প্রকৃত অর্থে ও নিশ্চিতরূপে কুরআন শরীফ বুঝেছিলেন, তিনি তাঁদের খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে তুলে নিয়েছেন, কিন্তু একথা তো তাঁর প্রতিশ্রুতি পরিপন্থি। যেমনটি তিনি বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

অর্থাৎ আমরাই এ উপদেশবাণী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সুরক্ষা করব। (আল-হিজর: ১০) আমি বুঝতে পারি না, যাঁরা কুরআন বুঝেছেন তাঁরাই যদি না থাকেন এবং যাঁরা এর ওপর নিশ্চিতরূপে ও আধ্যাত্মিক মানে উপনীত হয়ে ঈমান এনেছিলেন তাঁরাই যদি হারিয়ে যান তবে কুরআনের সুরক্ষা কীভাবে হতো? সুরক্ষা দ্বারা কি এমন সুরক্ষা বুঝানো হয়েছে যে, কুরআন শরীফ খুব সুন্দর অক্ষরে লিপিবদ্ধ গ্রন্থ আকারে সেসব গুপ্তধনের মতো কিয়ামত পর্যন্ত সিন্দুকে আবদ্ধ থাকবে যা কারো কোনো কাজে না লাগলেও মাটির নীচে সংরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে? কেউ কি ভাবতে পারে যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লার এটিই উদ্দেশ্য? আর এটিই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে এ ধরনের সুরক্ষা তো কোনো উৎকর্ষের পরিচায়ক নয়, বরং এটি হবে একটি হাস্যকর কথা। এমন সুরক্ষার কথা মুখে আনার অর্থ হলো শত্রুকে হাসির খোরাক জোগানো। কেননা প্রকৃত উদ্দেশ্যই যদি ব্যাহত হয় তাহলে বাহ্যিক সুরক্ষায় কী লাভ? এমনও হতে পারে যে, ইনজীল অথবা তওরাতের কোনো পাণ্ডুলিপিও এভাবেই কোনো গুহায় সুরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। পৃথিবীতে এ ধরনের হাজার হাজার বই পাওয়া যায়, যেগুলোকে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই নিশ্চিতরূপে কোনো লেখকের লেখা বলে মনে করা হয়। কাজেই এতে বিশেষত্বের কী আছে এবং এর দ্বারা উম্মতের বিশেষ কী লাভ হয়েছে? যদিও আমি অস্বীকার করি না যে, পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক সুরক্ষাও পৃথিবীর অন্য সব পুস্তকপুস্তিকার চেয়ে বেশি হয়েছে এবং এটি অলৌকিক নিদর্শনও বটে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টি তো আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর প্রতি। আমরা তাঁর সত্তা সম্পর্কে কখনোই এমন ধারণা পোষণ করতে পারি না যে, এই সুরক্ষার মাধ্যমে তিনি শুধু শব্দ ও অক্ষরগুলোর সুরক্ষাই বুঝিয়েছেন। অথচ (যিকর) زُكْر শব্দটিও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে যে, যিকর হিসেবে পবিত্র কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে এবং এর প্রকৃত যাকের বা স্মরণ করানোর মানুষ সর্বদা সৃষ্টি হতে থাকবে। আরেকটি আয়াতেও হুবহু একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে আর সে আয়াতটি হলো,

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

(আল-আনকাবূত: ৫০)

অর্থাৎ কুরআন হলো সুস্পষ্ট আয়াত যা জ্ঞানীদের হৃদয়ে রয়েছে। জানা কথা, এ আয়াতের অর্থ হলো, মু'মিনদেরকে কুরআন শরীফের জ্ঞান আর একই সাথে এর ওপর আমলের শক্তিও দান করা হয়েছে। এছাড়া পবিত্র কুরআনের ঠিকানা যখন মু'মিনদের মনের মনিকোঠা নির্ধারিত হলো তখন

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

[অর্থাৎ আমরাই এ উপদেশবাণী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সুরক্ষা করব। (আল-হিজর: ১০)– অনুবাদক]– এ আয়াতের অর্থ এটি ছাড়া আর কী হতে পারে যে, যেভাবে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের হৃদয় হতে তওরাত ও ইনজীলকে বিস্মৃত করা হয়েছে সেভাবে কুরআনকে হৃদয় হতে মুছে ফেলা যাবে না। যদিও তওরাত ও ইনজীল তাদের হাতে ও সিন্দুকে (রক্ষিত) ছিল কিন্তু তাদের হৃদয় হতে মুছে গেছে। অর্থাৎ তাদের হৃদয় সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে নি আর তারা তাদের হৃদয়ে তওরাত ও ইনজীলকে প্রতিষ্ঠিত ও ধরে রাখে নি। মোটকথা এ আয়াতটি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করছে, কুরআনের শিক্ষার কোনো অংশই বিনষ্ট বা ধ্বংস হবে না। হৃদয়সমূহে এর চারা প্রথম দিন যেভাবে রোপিত হয়েছে সেভাবেই এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।

দ্বিতীয়ত এ বিষয়কে বিবেক যেভাবে আবশ্যিক ও চূড়ান্ত মনে করে, অর্থাৎ বিভিন্ন ঐশীগ্রন্থের চিরন্তন শিক্ষা ও জ্ঞানের জন্য সর্বদা নবীদের মতো ইলহামপ্রাপ্ত এবং খোদার সাথে বাক্যালাপকারী ও ঐশী জ্ঞানের অধিকারী মানুষ বিভিন্ন সময়ে জন্ম নিতে থাকা আবশ্যিক; অনুরূপভাবে আমরা যখন কুরআনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি এবং এর প্রতি গভীর মনোযোগের সাথে মনোনিবেশ করি তখন দেখতে পাই, এই (কুরআনও) সরব কণ্ঠে বলছে, সবসময় আধ্যাত্মিক শিক্ষকদের উপস্থিতির বিষয়টি তাঁর আদি পরিকল্পনায় নির্ধারিত রয়েছে।

দেখুন! মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেন,

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَكُنْثُ فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ যে জিনিস মানুষের জন্য কল্যাণকর পৃথিবীতে তা স্থায়ী হয়। (১৩)

পারা, আর-রাদ: ১৮)। এখন এটি সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে অধিকাংশ মানবহিতৈষী গোষ্ঠী হলেন নবীরা, যাঁরা বিভিন্ন অলৌকিক লীলা, নিদর্শন, ভবিষ্যদ্বাণী, প্রকৃত সত্য, তত্ত্বজ্ঞান এবং নিজেদের সত্যতার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মানুষের ঈমানকে সুদৃঢ় করেন এবং সত্যান্বেষীদের ধর্মীয় কল্যাণে ভূষিত করেন। আর এটিও সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে তাঁরা দীর্ঘকাল অবস্থান করেন না, বরং অল্প কিছুকাল জীবনযাপনের পর এ জগৎ থেকে তিরোহিত হন। কিন্তু আয়াতটির বিষয় বস্তুতে কোনো স্ববিরোধ নেই আর আল্লাহ্ তা'লার কালামে স্ববিরোধ থাকবে তা-ও সম্ভব নয়।

সুতরাং এ আয়াতটিকে নবীদের সাথে সম্পৃক্ত করলে এর অর্থ দাঁড়াবে, প্রতিচ্ছায়ারূপে নবীদের স্থায়ীত্ব দেওয়া হয় এবং প্রতিটি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে যিল তথা ছায়ারূপে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কোনো বান্দাকে তাদের নযীর বা মসীল তথা সদৃশ বানিয়ে দেন, যিনি তাদেরই রঙে রঙিন হয়ে তাঁদের স্থায়ী জীবনের কারণ হন। এই যিল্লি বা প্রতিচ্ছায়ারূপী অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত রাখতেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের দোয়া শিখিয়েছেন,

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের সেই সহজ ও সরল পথের সন্ধান দাও যা তোমার সেসব বান্দার পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। (আল-ফাতিহা: ৬-৭)। এটি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'লা নবীদেরকে যে পুরস্কারে ভূষিত করেছেন আর যা যাচনার নির্দেশ এই দোয়ায় রয়েছে তা দিরহাম বা দিনারের মতো কিছু নয়, বরং এগুলো হলো, নূর বা আলো, কল্যাণরাজি, ভালোবাসা, দৃঢ়বিশ্বাস, অলৌকিক নিদর্শন, ঐশী সাহায্য ও সমর্থন, কবুলিয়ত বা গ্রহণীয়তা, পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান, ওহী এবং কাশফ বা দিব্যদর্শনের পুরস্কার। আল্লাহ্ তা'লা এ উম্মতকে এসব পুরস্কার যাচনার আদেশ দেবার পূর্বেই তা প্রদানে সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন।

অতএব এ আয়াতের মাধ্যমেও সুস্পষ্টরূপে এটিই প্রমাণ হলো যে, আল্লাহ্ তা'লা এ উম্মতকে যিল্লি বা ছায়ারূপে সব নবীর উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছেন যেন নবীদের অস্তিত্ব প্রতিচ্ছায়ারূপে সদা বিদ্যমান থাকে এবং এ পৃথিবী যেন তাঁদের অস্তিত্ব হতে কখনোই খালি না থাকে। আল্লাহ্ তা'লা শুধু দোয়া করার আদেশই দেন নি, বরং একটি আয়াতে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। আর তা হলো,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ যারাই আমাদের সহজ ও সরল পথের উদ্দেশ্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবে তাদেরকে আমরা অবশ্যই আমাদের পথের দিশা দেবো (আল-আনকাবুত: ৭০)। আর একথাও পরিষ্কার যে, নবীদেরকে যে পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছিল সেটিই আল্লাহর পথ।

এ ছাড়াও আরো কিছু আয়াত রয়েছে যা থেকে প্রমাণ হয়, পরম করণাময় আল্লাহ চেয়েছেন সর্বদাই যেন নবীদের উত্তরাধিকারী আধ্যাত্মিক শিক্ষক অবশ্যই জন্ম নিতে থাকেন। সে আয়াতগুলো হলো,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

(আন-নূর: ৫৬)

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا أُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا
مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ

(আর-রাদ: ৩২)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

(বনী ইসরাঈল: ১৬)

অর্থাৎ হে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মু'মিনেরা! আল্লাহ তা'লা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমাদেরকেও তিনি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন, যেভাবে তিনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিযুক্ত করেছিলেন। আর দৈহিক কিংবা আধ্যাত্মিক যে ধরনেরই হোক না কেন, সর্বদাই কাফেরদের ওপর দুঃখদুর্দশা নিপতিত হতে থাকবে অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী হয়ে যাবে যতক্ষণ না আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় আর আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। কোনো জাতিকে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তিতে নিপতিত করি না যতক্ষণ না আমরা তাদের মাঝে এক রসূল প্রেরণ করি।

কোনো ব্যক্তি যদি এসব আয়াত গভীর অভিনিবেশ ও মনোযোগের সাথে দেখে তাহলে আমি কীভাবে বলতে পারি, আল্লাহ তা'লা এ উম্মতের জন্য

সুস্পষ্টভাবে চিরস্থায়ী খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন— একথা সে বুঝতে পারবে না? খিলাফত চিরস্থায়ী না হলে মূসায়ী শরীয়তের খলীফাদের সাথে তুলনা করার অর্থ কি? শুধু ত্রিশ বছরেই যদি খিলাফতে রাশেদার যুগপরিক্রমা শেষ হয়ে যায় তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা কখনোই এ উম্মতের মাঝে সৌভাগ্যের দ্বার চিরকাল উন্মুক্ত রাখতে চান নি। কেননা আধ্যাত্মিক ধারার মৃত্যু হলে ধর্মের মৃত্যু অনিবার্য আর এমন ধর্ম নিজেকে কখনো জীবন্ত ধর্ম বলে দাবি করতে পারে না যার মান্যকারীরা নিজ মুখেই স্বীকার করে নেয় যে, এ ধর্ম ১৩০০ বছর যাবৎ মরে পড়ে আছে আর এ ধর্মের জন্য আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে নিহিত প্রকৃত জীবনসঞ্চারী আলো উত্তরাধিকারসূত্রে অন্যদের মাঝে সঞ্চারিত করতে কখনোই চান নি।

পরিতাপ! এমন ধারণায় বদ্ধমূল লোকেরা ‘খলীফা’ শব্দটি নিয়েও গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে না যা ‘ইস্তেখলাফ’ শব্দ হতে উদ্ভূত, কেননা স্থলাভিষিক্তকে খলীফা বলা হয়। আর প্রকৃত অর্থে তিনিই রসূলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন যিনি নিজের মাঝে প্রতিচ্ছায়ারূপে রসূলের উৎকর্ষপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অত্যাচারী রাজাবাদশার জন্য ‘খলীফা’ শব্দটির ব্যবহার পছন্দ করেন নি। কেননা খলীফা আসলে রাসূলের যিল বা ছায়া হয়ে থাকেন। আর কোনো মানুষের পক্ষে যেহেতু চিরজীবী হওয়া সম্ভব নয়, তাই আল্লাহ্ তা'লা রাসূলদের সেই অস্তিত্বকে প্রতিচ্ছায়ারূপে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেয়েছেন যা পৃথিবীর সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ও সর্বোত্তম। সুতরাং এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতকে প্রবর্তন করেছেন যেন কখনোই এবং কোনো যুগেই রিসালাতের এ কল্যাণ থেকে জগদ্বাসী বঞ্চিত না থাকে। কাজেই যে ব্যক্তি মনে করে খিলাফত কেবল ৩০ বছর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ সে আসলে নিজ অজ্ঞতার জন্যই খিলাফতের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে আর সে জানে না, মহান আল্লাহর এ অভিপ্রায় কখনোই ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর পর কেবল ৩০ বছর পর্যন্তই নবুওয়তের কল্যাণ খলীফাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাখা আবশ্যিক; এরপর পৃথিবী ধ্বংস হলেও কোনো সমস্যা নেই! বরং প্রাথমিক যুগে খলীফাদের উপস্থিতি তো ইসলামের প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিস্তার ছাড়া বিশেষ কোনো প্রয়োজন রাখত না। কেননা রিসালতের জ্যোতি ও নবুওয়তের উৎকর্ষ তো সবেমাত্র বিস্তার লাভ

করছিল আর তখনও শতসহস্র মুজিয়া তথা অলৌকিক নিদর্শন বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হচ্ছিল। আর আল্লাহ তা'লা চাইলে এই চার খলীফার ৩০ বছরের পরিবর্তে মহানবী (সা.)-কেই আরো ৩০ বছর জীবিত রাখতে পারতেন আর এটি তাঁর রীতিনীতি ও বিধানের পরিপন্থি কাজও হতো না। এ ৩০ বছর যোগ করলে নবী করীম (সা.)-এর সর্বমোট বয়স হতো ৯৩ বছর। মানুষের বয়স সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, এ যুগের গড় আয়ুর নিরিখে এ বয়স খুব একটা বেশি নয় আর এটি প্রকৃতির নিয়ম বহির্ভূতও নয়।

অতএব আল্লাহ তা'লা শুধু ৩০ বছর পর্যন্ত এ উম্মতের জন্য চিহ্নিত ছিলেন, এরপর তাদেরকে তিনি চিরতরে পথভ্রষ্টতার মাঝে ছেড়ে দিয়েছেন এবং আদিকাল থেকে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতে খিলাফতের দর্পণে যে নূর বা ঐশী জ্যোতি দেখিয়েছেন তা তিনি এ উম্মতকে দেখানো পছন্দ করেন নি—এমন হীন ধারণা আল্লাহ তা'লা সম্পর্কে পোষণ করা ঠিক নয়। কোনো সুস্থ বিবেক কি পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করতে পারে? না, কখনোই না।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

(আল-আম্বিয়া: ১০৬)

[অর্থাৎ আর নিশ্চয় আমরা দাউদের প্রার্থনা সঙ্গীতে উপদেশবাণীর পর লিখে দিয়েছি, আমার পুণ্যবান বান্দারা প্রতিশ্রুত দেশের উত্তরাধিকারী হবে। —অনুবাদক)— এ আয়াতও ইমামদের খিলাফতের বিষয়ে সরব সাক্ষ্য বহন করছে। কেননা هُتِّمَتْ (ইয়ারিসুহা) শব্দটি স্থায়ীত্ব চায়, তাই এ আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে, ইসলামী খিলাফত চিরস্থায়ী। এর কারণ, শেষ পালা যদি পাপাচারীদের হয় তবে তারাই হবে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী, পুণ্যবানরা নয়। কেননা সবকিছুর উত্তরাধিকারী তারাই হয়, যারা সবার শেষে থাকে।

এছাড়া এ বিষয়েও প্রাধান্য করা উচিত, আল্লাহ তা'লা যেহেতু একটি উপমা দিয়ে বুঝিয়ে ছিলেন, মূসার পর যেভাবে আমি খলীফা মনোনীত করেছি সেভাবে এ উম্মতের মাঝেও খলীফা মনোনীত করতে থাকব, তাই দেখা উচিত ছিল, হযরত মূসার মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'লা কী ব্যবস্থা করেছিলেন? তিনি কি কেবল ৩০ বছর পর্যন্ত খলীফাদের প্রেরণ করেছিলেন নাকি এ ধারাকে ১৪০০

বছর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন? আবার যেহেতু হযরত মূসা (আ.)-এর চেয়ে আমাদের নবী (সা.)-এর ওপর আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহ অনেক বেশি ছিল; যেমন তিনি নিজেই বলেছেন,

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

[অর্থাৎ তোমার প্রতি আল্লাহর এক মহা অনুগ্রহ রয়েছে। (আন-নিসা: ১১৪)- অনুবাদক] এবং একইভাবে তিনি এ উম্মত সম্পর্কে বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

[অর্থাৎ তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। (আলে ইমরান: ১১১)- অনুবাদক] প্রশ্ন হলো হযরত মূসার খলীফাদের ধারা ১৪০০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে কিন্তু এখানে মাত্র ৩০ বছরেই খিলাফতের সমাপ্তি ঘটবে- এটি কীভাবে সম্ভব? সুতরাং এ উম্মত যদি খিলাফতের আধ্যাত্মিক জ্যোতি থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত থাকে তাহলে কেউ বলুন, اُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ [অর্থাৎ তাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।- অনুবাদক]- এ আয়াতের অর্থ কী? প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে, 'যে নিজেই পথহারা সে কীভাবে অন্যকে পথ দেখাবে' বা 'এক অন্ধ কীভাবে আরেক অন্ধকে পথ দেখাতে পারে!' এ উম্মতকে যখন চিরকাল অন্ধ রাখাই উদ্দেশ্য এবং এ ধর্মকে মৃত রাখাই আসল লক্ষ্য তখন একথা বলার কী অর্থ যে 'তোমরাই সর্বোত্তম (উম্মত) এবং মানুষের হিতসাধন ও পথ প্রদর্শনের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে?' এক অন্ধ কি আরেক অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? অতএব হে লোকসকল! যারা মুসলমান হবার দাবি করে থাকো, আল্লাহর দোহাই লাগে একটু ভেবে দেখো, কেননা এ আয়াতের অর্থ হলো, তোমাদের মাঝে আধ্যাত্মিক জীবন ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী হবে আর অন্য ধর্মাবলম্বীরা তোমাদের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক জ্যোতি লাভ করবে। এই আধ্যাত্মিক জীবন ও অন্তর্দৃষ্টি নিজের মাঝে ভিন্ন ধর্মের লোকদেরকে সত্যের প্রতি আস্থানের সামর্থ্য রাখে। এটিই হলো সেই জিনিস যাকে অন্য ভাষায় খিলাফত বলা হয়। অতএব কীভাবে বলো, খিলাফত কেবল ৩০ বছর পর্যন্তই স্থায়ী ছিল আর এরপর বিলুপ্ত হয়ে গেছে? আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করো।

এখন স্মরণ রাখতে হবে যে, যদিও পবিত্র কুরআনে এ ধরনের অনেক

আয়াত রয়েছে যা এ উম্মতের মাঝে চিরস্থায়ী খিলাফতের সুসংবাদ দেয় এবং এ বিষয়ে অনেক হাদীসও রয়েছে, তথাপি যারা প্রমাণিত তথ্যকে মহামূল্যবান সম্পদ মনে করে গ্রহণ করে তাদের জন্য কার্যত এতটুকু লেখাই যথেষ্ট। ইসলামকে যদি মৃত ধর্ম মনে করা হয় এবং এর কল্যাণরাজিকে যদি শুধু প্রথম শতাব্দী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা হয় তবে ইসলামের প্রতি এর চেয়ে বড়ো শত্রুতা আর হতে পারে না। যে কিতাব চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দেয় তা কি এমন হীনম্মন্যতার শিক্ষা দিতে পারে যে, ভবিষ্যতে কোনো কল্যাণ ও খিলাফত নেই, বরং সবকিছুই রয়ে গেছে অতীতে? এ উম্মতের মাঝে নবী আসবে না, এখন যদি নবীর খলীফাও না আসেন এবং বিভিন্ন সময়ে আধ্যাত্মিক জীবনের কেরামতও না দেখান তবে তো ইসলামের আধ্যাত্মিকতারই অবসান ঘটে।

অতএব এমন ধর্মের সাথে মুসায়ী ধর্মের আধ্যাত্মিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদার তুলনাইবা কী, যাতে ১৪০০ বছর পর্যন্ত হাজার হাজার আধ্যাত্মিক খলীফা মনোনীত হয়েছেন। পরিতাপ! আমাদের আপত্তিকারীরা একটুও ভাবে না যে, এ অবস্থায় ইসলাম ধর্ম নিজ আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অতীব তুচ্ছ সাব্যস্ত হয় এবং মহানবী (সা.) ﷺ তেমন বড়ো কোনো নবী হিসেবে বিবেচিত হন না আর পবিত্র কুরআনও এমন বড়ো কোনো ধর্মগ্রন্থ সাব্যস্ত হয় না যা নিজ জ্যোতিতে শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টিকারী। এরপরও ‘এই উম্মত সর্বোত্তম উম্মত এবং অন্যান্য উম্মতের জন্য সবদা আধ্যাত্মিক হিতসাধনকারী আর সমস্ত ঐশী কিতাবের তুলনায় এই কুরআন হলো, নিজ পরাকাষ্ঠা, প্রভাব ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ এবং এই রসূল (সা.) স্বীয় পবিত্রকরণ শক্তি ও নৈতিক উৎকর্ষতায় সকল রসূল অপেক্ষা পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠ’— এসব কথা বলা কতটা বাজে, অর্থহীন ও ভিত্তিহীন দাবি বলে গণ্য হবে! এছাড়াও নিশ্চিতরূপে আরো বড়ো একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে আর তা হলো, কুরআনী শিক্ষামালার যে অংশ আধ্যাত্মিক জ্যোতি ও উৎকর্ষের দিক থেকে মানুষকে নবীদের সদৃশ বানাতে চায় তা চিরদিনের জন্য বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কেননা উম্মতের মাঝে যেহেতু খিলাফতের অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ সাধনের যোগ্যতাই নেই, তাই এ মর্যাদা লাভের প্রেরণা জাহত করে এমন শিক্ষা আর কখনোই অর্জন হবে না। ‘ইসলাম কি এখন স্থায়ীভাবে মৃত একটি ধর্ম, যাতে এমন লোক জন্মে না যাঁদের কেরামত মুজিয়ার মর্যাদা রাখে এবং যাঁর ইলহাম ওহী সমতুল্য?’—

এমন কথা শুনলে গা শিউরে ওঠে। نُؤُودُ بِاللّٰهِ কোনো মুসলমানের কি এমন বিশ্বাসও থাকতে পারে? নাস্তিকতাপূর্ণ চিন্তাভাবনার বেড়াজালে আবদ্ধ লোকদের আল্লাহ্ হিদায়াত দিন।

এখন যেহেতু কুরআন শরীফের আলোকে এটিই প্রমাণ হলো যে, কৃপাধন্য এ উম্মতের মাঝে হুবহু সেভাবেই চিরস্থায়ী খিলাফতের ধারা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, শুধু এতটা শব্দগত পার্থক্য রয়েছে যে, তখন খ্রিষ্টধর্মের সাহায্যকল্পে নবী আসতেন আর এখন আসেন মুহাম্মদ। কাজেই এই প্রমাণের কারণে একথাও অবশ্যই মানতে হয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়তের শেষ প্রান্তে যেভাবে ঈসা নামের একজন নবী ঠিক এমন সময় এসে ছিলেন যখন ইহুদীদের চারিত্রিক অবস্থা পুরোপুরি বিকারগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল আর তারা সত্যিকার তাকওয়া, সততা, জাতিগত সহানুভূতি, ঐক্য ও সত্যিকার খোদাভীতি হতে পুরোপুরি দূরে সরে গিয়েছিল এবং তাদের জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার দৌড় কেবল বাহ্যিক বাকপটুতা ও গুরু কথা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল আর একইভাবে তারা পার্থিবভাবেও দুর্বল ও লাঞ্ছনাদায়ক অবস্থায় ছিল; অনুরূপভাবে এ উম্মতের মাঝেও সেই নবী সদৃশ এবং সেই যুগের অনুরূপ একজন মুহাম্মদের জন্ম নেওয়া আবশ্যিক। কেননা এ উম্মতও সেভাবেই বিকৃতির শিকার হয়েছে যেভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে ইহুদীরা বিকৃত হয়েছিল। গভীরভাবে দেখলে ও সন্ধানী দৃষ্টিতে চিন্তা করলে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে বুঝা যায়, এটিই সেই যুগ যাতে আমরা অবস্থান করছি; মূসায়ী ও মুহাম্মদী খলীফার ধারার মাঝে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য রক্ষা করতে এ উম্মতের মাঝেও হযরত ঈসাসদৃশ সত্তার জন্ম নেওয়া উচিত। কেননা হযরত মূসা (আ.) থেকে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ছিল প্রায় ১৪০০ বছর, বর্তমানে আমাদের নবী (সা.)-এর যুগও চতুর্দশ শতাব্দীতে উপনীত হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মত চতুর্দশ শতাব্দীতে পদার্পণের পর এমনভাবে বিকৃতির শিকার হয়েছিল যে, তাদের খোদাভীতি ও সততা একেবারেই লোপ পেয়েছিল এবং ইহুদী আলেমরা অর্থহীন মতবিরোধ ও স্বার্থপরতামূলক বিবাদে লিপ্ত ছিল, তাদের মাঝে প্রচুর ভ্রষ্টতা ও পাপাচার ছাড়িয়ে পড়েছিল আর তাদের পার্থিব অবস্থারও অনেক অবনতি ঘটেছিল; অনুরূপভাবে বর্তমানে এ উম্মতেরও একই অবস্থা। দৃশ্যমান ঘটনাবলি সাক্ষ্য

দিচ্ছে যে, এই উম্মত এবং এই উম্মতের আলেম সমাজও আসলে হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগের ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। তাদের মধ্যে থেকেও সততা, খোদাভীতি, আধ্যাত্মিকতা ও সত্য চেনার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে। তারা শুধু এসব বিষয়ের ক্ষেত্রেই সেই যুগের ইহুদীদের সদৃশ হয় নি, বরং পার্থিব দুর্দশা সেভাবেই তাদের সঙ্গী হয়েছে যেভাবে সে যুগে ছিল। তখন রোমান সম্রাট যেভাবে ইহুদী রাজ্যগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং তারা—

صُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

[অর্থাৎ তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য অবধারিত করে দেওয়া হলো (আল-বাকারা: ৬২)– অনুবাদক]– এর মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছিল এবং নিজেদের দুর্বল ও অসহায় অবস্থা দেখে ইহুদীরা যেভাবে এমন একজন মসীহর জন্য অপেক্ষমাণ ছিল যিনি রাজার বেশে আসবেন এবং রোমানদের বিরুদ্ধে তরবারি হাতে নেবেন; কেননা তওরাতের শেষাংশে এ প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে এ মুসলিম জাতিও সর্বোতভাবে অধঃপতিত অবস্থায় রয়েছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোনো রাজত্ব যদি থেকেও থাকে তবে একেও অভ্যন্তরীণ কপটতা, মন্ত্রী ও আমলাদের অসাধুতা এবং রাজাবাদশাদের অলসতা ও ঔদাসীন্য, অজ্ঞতা ও মূর্থতা, ভোগবিলাস ও আরামপ্রিয়তা এমনভাবে দুর্বল করে দিয়েছে যে, এখন এগুলোর মুমূর্ষু অবস্থা ই চোখে পড়ে। আর এরাও ইহুদীদের মতো এমন একজন প্রতিশ্রুত মসীহর জন্য অপেক্ষমাণ ছিল যিনি রাজাবাদশাদের মত মহাপ্রতাপের সাথে তাদের সাহায্যার্থে অবতরণ করবেন।

এখন এ দুটি অবস্থা ও ঘটনাপ্রবাহ সমান কিনা তা এখানে দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ দেখে নিক এবং ন্যায়পরায়ণ হৃদয় যাচাই করুক আর চিন্তাশীল বিবেক লক্ষ করে দেখুক। ভবিষ্যদ্বাণীর কথা না হয় কিছুক্ষণের জন্য ভুলেই যান এবং একজন গবেষকের ন্যায় যৌক্তিকভাবেই দেখুন, এ যুগের মুসলমান ও হযরত ঈসার যুগের ইহুদীদের কার্যকলাপ ‘জুতার অনুরূপ জুতা’– কথার সত্যায়ন করে কিনা? ইনজীলের প্রতি অভিনিবেশ করে দেখুন এবং পড়ুন, কেননা ইহুদী মৌলভী ও ফকীহদের অবস্থা সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.) যা কিছু লিখেছেন এবং তাদের অসাধুতা সম্পর্কে যা কিছু প্রকাশ করেছেন তা কি বর্তমান যুগের মুসলমান মৌলভীদের মাঝেও দেখা যায় না? ‘আমাদের

আলেম সমাজও ইহুদী ফকীহদের মতোই অহর্নিশি অনর্থক কলহ-বিবাদে লিপ্ত, পুরোপুরি আধ্যাত্মিকতা শূন্য আর অন্যদের কাফের সাব্যস্ত করার অপচেষ্টায় ব্যস্ত অথচ তারা নিজেরাই জানে না ইসলাম কী জিনিস! তারা এমন সব বক্তৃতা করে যার ওপর নিজেরাই আমল করে না, অর্থ উপার্জনের জন্য বক্তৃতা করতে দূরদূরান্তে চলে যায় এবং ভিত্তিহীন অলীক গালগল্প বলে সাধারণ মানুষকে খুশি করে অবৈধ সম্পদ ভক্ষণ করে আর ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও চালাকির ক্ষেত্রে ইহুদীদের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়’— একথাগুলো কি সত্য নয়? জগৎপূজারি লোকদের অবস্থাও অভিন্ন, কেননা তাদের অধিকাংশই পার্থিব ধনসম্পদ অর্জনের নিমিত্তে সব ধরনের দুর্নীতি ও মিথ্যা বলাকে মায়ের দুধের ন্যায় হালাল মনে করে। এছাড়া যারা নিজেদের জমিদার বলে দাবি করে তাদের হাতে নামেমাত্র যতটুকু জমিদারি আছে তা-ও তাদের ভোগবিলাস ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের অনেকেই পানির মতো মদ পান করে এবং ব্যভিচারকে বিন্দুমাত্রও ঘৃণা করে না। তাদের মাঝে দিন বা রাতের কোনো অংশেই খোদার ভয় জাহ্রত হয় না।

এখন ইহুদীদের ইতিহাস ঘেঁটে দেখুন! ধর্মীয় ও জাগতিক অধঃপতনের ক্ষেত্রে এই মুসলমানদের সাথে সেই ইহুদীদের কেমন অসাধারণ মিল যারা হযরত ঈসার যুগে ছিল। তওরাতে ইহুদীদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, ‘সীলা’ না আসা পর্যন্ত তাদের রাজত্ব হারাবে না, ‘সীলা’ অর্থ হযরত ঈসা। আর বাস্তবেও তেমনই ঘটেছিল, হযরত ঈসার জন্মের কিছুকাল পূর্বে ইহুদীদের বিভিন্ন রাজ্যের ওপর রোমান সাম্রাজ্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এছাড়া সে যুগের ইহুদীরাও যেহেতু বর্তমান যুগের মুসলমানদের মতো পারস্পরিক কপটতা, নিত্যদিনের ঝগড়াবিবাদ, আলস্য ও অজ্ঞতার আধিক্যের কারণে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা তাদের জন্য নিশ্চিতভাবে এক অশনি সংকেত ছিল, তাই হযরত ঈসার যুগের অল্প কিছুকাল পূর্বের ইহুদীরা নিজেরাই নিজেদেরকে রোমান সাম্রাজ্যের হাতে তুলে দিয়েছিল। আর সাদৃশ্যের দিক থেকে এ উন্মত্তের মাঝেও একজন ‘সীলা’ আসা আবশ্যিক ছিল, যিনি ঠিক ধর্মীয় ও জাগতিক অবক্ষয়ের যুগে আসবেন।

মুসলমানদের এই যুগ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনও আসলে এমনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যা হযরত ঈসার যুগের সাথে সময়কাল ইত্যাদি আবশ্যিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন তিনি বলেছেন,

مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ

(আল-আম্বিয়া: ৯৭)

অর্থাত্

اي مِنْ كُلِّ حَذَبٍ يَنْسِلُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ يَفْسِدُونَ
فِي أَرْضِهِ وَ يَتَمَلَكُونَ بِلَادِهِ وَ يَجْعَلُونَ أَعْزَةَ أَهْلُهَا أَذْلَةً

এ আয়াতের অর্থ হলো, খ্রিষ্টান জাতি যারা ইয়াজুজ ও মাজুজের দল হবে তারা সকল উচ্চস্থান হতে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর দিকে ছুটে আসবে এবং তারা বিজয় লাভ করবে আর ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে পরাভূত করতে থাকবে, এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর শুধু নাম অবশিষ্ট থাকবে, যেমনটি বর্তমানে রয়েছে। ঘটনাবলির সাদৃশ্য দেখুন! ইসলামের বিপদাপদ এবং মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাগতিক অধঃপতনের যুগ ইহুদীদের সেই যুগের সাথে কীভাবে ছবছ মিলে গেছে যা হযরত ঈসার যুগে ছিল। আবার দেখুন! ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর দুর্বলতা ও বিরোধীদের প্রাধান্য লাভের বিষয়ে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ইসরাঈলী সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে তওরাতে কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর মাঝে কেমন মিল রয়েছে। তবে হ্যাঁ! মুজাদ্দিদের সুসংবাদ সম্পর্কে তওরাত এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীতে কেবল বর্ণনার পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে। অর্থাত্ তওরাতে তো ইসরাঈলকেও ক্ষমতার বাগডোর ও লাঠি হারিয়ে বসার সময়, অর্থাত্ রাজত্ব হারানোর যুগে ‘সীলা’-র আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কুরআনে ইসলামী শক্তি হ্রাস পাবার এবং অরাজকতার উত্তাল ঢেউ উঠার যুগ, অর্থাত্ খ্রিষ্টান বক্তাদের মিথ্যাচারের যুগে نَفَخَ صُور (অর্থাত্ শিঙা বাজানোর- অনুবাদক) সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে শিঙা বাজানোর অর্থ কিয়ামত নয়, কেননা খ্রিষ্টানদের অরাজকতার উত্তাল ঢেউ ওঠার পর শত বছরেরও অধিক সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো কিয়ামত সংগঠিত হয় নি। বরং এর অর্থ হলো, কোনো মাহদী ও মুজাদ্দি প্রেরণ করে যেন হেদায়েতের শিঙা বাজানো হয় এবং পথভ্রষ্টতার কারণে মৃত লোকদের মাঝে যেন পুনরায় (আধ্যাত্মিক) প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

কেননা ‘শিঙা বাজানো’ শুধু দৈহিক জীবন ও মরণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আধ্যাত্মিক জীবন ও মৃত্যুও সর্বদা শিঙা বাজার ফলেই সংঘটিত হয়।

খ্রিষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে কুরআনে যেভাবে শিঙা বাজানো বলতে কোনো মুজাদ্দিদ প্রেরণকে বুঝিয়েছে, একইভাবে অরাজকতার ঢেউ বলতে সেই দাজ্জালিয়াত বা মিথ্যাচারকে বুঝায় যা হাদীসে শরীফে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল বা মিথ্যাবাদী, প্রতারক নামে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিশ্রুত দাজ্জাল ও প্রতিশ্রুত মসীহ শব্দ দুটি হাদীস শরীফে এলেও পবিত্র কুরআনের কোথাও আল্লাহ তা'লা এর উল্লেখ করেন নি। বরং দাজ্জালের পরিবর্তে খ্রিষ্টানদের অরাজকতাপূর্ণ কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ مِنْ كُلِّ حَرْبٍ يَنْسُؤْنَ [অর্থাৎ তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ধেয়ে আসবে (আল-আম্বিয়া: ৯৭)– অনুবাদক]– এ আয়াতেও এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। আর অনুরূপভাবে আগমনকারী মুজাদ্দিদের কথা কুরআন শরীফের কোথাও ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ হয় নি, বরং نَفْخُ صُورٍ [‘শিঙা বাজানো হবে’– অনুবাদক] শব্দের মাধ্যমে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যাতে বুঝা যায় ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ জাগতিক ও পার্থিব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আবির্ভূত হবেন না, বরং তাঁর সাফল্য ও উত্থানের ভিত্তি থাকবে ঐশী ফুঁৎকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার শক্তি এবং ঐশী নির্দেশাবলির মাধ্যমে মানুষকে তিনি পরম সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করবেন। কেননা তিনি তরবারির সাথে সম্পর্কিত নৈরাজ্যের যুগে নয়, বরং যুক্তিপ্রমাণের সাথে সম্পর্কিত অরাজকতার যুগে আবির্ভূত হবেন।

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তা'লা নৈরাজ্যের ধরন অনুযায়ী নবী ও মুজাদ্দিদ প্রেরণ করে থাকেন। যেমন– হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে ইহুদীদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের হাতে প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ও মুখের বুলি ছাড়া আর কিছুই ছিল না আর রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে তারা নিজেদের অপকর্ম ও অব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল, রোমানদের রাজ্য দখলে কোনো দ্রুতি ছিল না। পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুত মসীহের যুগের এ অবস্থার কথাই লেখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, কোনো সংস্কারক জন্ম নিলে তার প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শনের জন্য তরবারিও ব্যবহার করতে পারবে না, কেননা তাদের কাছে তো কোনো তরবারিই নেই আর এভাবেই ব্রিটিশরা খুব সহজেই দিল্লীর সিংহাসন দখল করে নিয়েছে যেভাবে রোমান সম্রাটরা ইহুদীদের রাজ্য ক্ষমতা দখল করেছিল। অর্থাৎ যা হয়েছে তা শুধু রাজাদের অপকর্ম ও অযোগ্যতার জন্যই

হয়েছে। এ দেশটি দখলের ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের কোনো ভুল ছিল না যার জন্য তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করা যাবে। বরং ‘নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মারা’-র উদাহরণটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এজন্যই এ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ মসীহর বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছেন এবং প্রবল সাদৃশ্যের কারণে তাকে ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ বলা হয়েছে। এই নামকরণ কোনো মনগড়া বিষয় নয়, বরং বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই এই নামের প্রয়োজন পড়েছে।

স্মরণ রাখা উচিত, পবিত্র কুরআনের একস্থানে ‘রুসুল’ শব্দের মাধ্যমেও ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হাদীস শরীফে যে-সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে কুরআন শরীফে সেগুলোর উল্লেখ কেন করা হয় নি। এর উত্তর হলো, পাঠক যেন এই ধোঁকায় না পড়ে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ বলতে আসলে সেই হযরত ঈসা (আ.)-কেই বুঝায় যার ওপর ইনজীল অবতীর্ণ হয়েছিল এবং একইভাবে দাজ্জাল বলতে কোনো বিশেষ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বুঝায়। কাজেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা প্রথমে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন যা—

فَلَمَّا تَوَفَّيْتُنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

[অর্থাৎ যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে (আল-মায়দা: ১১৮)- অনুবাদক]- এ আয়াত থেকে প্রমাণিত এবং এরপর আমাদের নবী (সা.)-এর খাতামুল আশ্বিয়া হবার বিষয়টিও প্রকাশ করেছেন। যেমন- তিনি বলেন,

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

[অর্থাৎ কিন্তু সে আল্লাহর রসুল ও খাতামান নাবিয়্যীন (আল-আহযাব: ৪১)- অনুবাদক]- এর মাধ্যমে তিনি সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় দূর করে দিয়েছেন। অতঃপর ইহুদীদের অনেকগুলো অবাধ্যতার কথা বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করে একাধারে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, সাধারণ মুসলমান ও মুসলমান আলেমদের শেষ অবস্থা এরূপই হবে।

এরপরে উল্লেখ করেছেন, আখেরী যামানায় খ্রিস্টানদের প্রাধান্য হবে, তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়বে, সবদিক থেকে অরাজকতার ঢেউ আছড়ে পড়বে এবং তারা সকল উঁচু স্থান থেকে ধেয়ে

আসবে, অর্থাৎ সবদিক থেকে তারা তাদের শক্তিসামর্থ্য, উন্নতি ও উচ্চতা প্রদর্শন করবে। বাহ্যিক শক্তি ও রাজত্বের দিক থেকেও তারা এতটা উন্নতি করবে যে, তাদের বিপরীতে অন্য সব দেশ ও রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে যাবে। তারা জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও উৎকর্ষ সাধন করবে, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবে আর বিরল ও বিস্ময়কর সব শিল্পের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে আর কলাকৌশল, সুপারিকল্পনা ও সুব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও উন্নতি করবে। জাগতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও এগুলো অর্জনে তারা দৃঢ়চিত্ত হবে। এছাড়া ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য সকল প্রকার সাধনা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও তারা সবার চেয়ে এগিয়ে থাকবে ও উন্নত হবে। অনুরূপভাবে জীবনযাত্রা, ব্যাবসাবাণিজ্য ও কৃষিকাজ, মোটকথা সব বিষয়ে সকল জাতির ওপর প্রাধান্য রাখবে ও অগ্রগামী থাকবে।

مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ

[অর্থাৎ তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ধেয়ে আসবে (আল-আম্বিয়া: ৯৭)– অনুবাদক]– আয়াতের এটিই অর্থ। কেননা ‘হাদাব’ শব্দটি যখন হরকতসহ বা দালের ওপর জবর সহ আসে তখন এর অর্থ হয় উচ্চ ভূমি আর ‘নাসাল’ অর্থ অগ্রগামী হওয়া ও দৌড়ানো। অর্থাৎ সম্ভাব্য সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিকে তারা ছাড়িয়ে যাবে। আর এটিই হলো ইয়াজুজ ও মাজুজ নামের এই শেষ জাতির অনেক বড়ো একটি লক্ষণ।

এছাড়া একই আলামত নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী পাদরিদের এ দলের, যাদের আরেক নাম প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। আর যেহেতু উচ্চ ভূমিকে ‘হাদাব’ বলে, তাই এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা সকল প্রকার জাগতিক উন্নতির অধিকারী হবে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থাকবে। এখানে প্রমাণ হয় যে, এ জাতিই ইয়াজুজ ও মাজুজ আর রাষ্ট্রীয় উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের নামকরণ করা হয়েছে ‘ইয়াজুজ ও মাজুজ’। এ জাতির মাঝে এমন সব লোকও আছে যারা ভ্রষ্টতার প্রসারে সর্বোচ্চ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছে এবং ‘দাজ্জালে আকবর বা সবচেয়ে বড়ো দাজ্জাল’ নামে অভিহিত হয়েছে। চরম পথভ্রষ্টতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, তখন نَفَخَ صُورُ করা হবে বা শিঙা বাজানো হবে এবং সব ফিরকাকে একই স্থানে সমবেত করা হবে। এ আয়াতের পরের আয়াতে জাহান্নামের কথা উল্লেখ রয়েছে, পবিত্র কুরআনের

বাগ্‌ধারা অনুযায়ী এটি একটি ভিন্ন আলোচনা। কেননা পবিত্র কুরআনের সাধারণ ভাষারীতি হলো, কখনো কখনো পৃথিবীর কোনো ঘটনা বর্ণনা করার সময় সামঞ্জস্য থাকার কারণে এর সাথে পরকালের কথাও উল্লেখ করা হয়। যারা গভীর মনোযোগের সাথে কুরআন শরীফ পাঠ করে তারা পর্যায়ক্রমে বাগ্‌ধারা আসার এ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত নয়।

আমাদের এই আলোচনার তৃতীয় অংশটি ছিল, একথার কী প্রমাণ আছে যে, এই অধমই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ যার উল্লেখ কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন আঙ্গিকে রয়েছে। অতএব আমার মতে এ অংশের জন্য অধিক যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের কোনো প্রয়োজন নেই। এ পুস্তিকায় আমরা প্রমাণ করেছি যে, এ উম্মতের মধ্যে থেকেই মসীহ (আ.)-এর নামে এক ব্যক্তির আগমন আবশ্যিক। এই আবশ্যিকতার তিনটি কারণ।

প্রথমত كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا [অর্থাৎ যেভাবে আমরা ফেরাউনের প্রতি এক রসূল পাঠিয়েছিলাম। (আল-মুযযামিল: ১৬)- অনুবাদক]- আয়াত থেকে বুঝা যায়, এ আয়াত আমাদের নবী (সা.)-এর সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর পরিপূর্ণ সাদৃশ্য দাবি করে। কেননা-

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

[অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি সাক্ষীরূপে এক রসূল পাঠিয়েছি যেভাবে আমরা ফেরাউনের প্রতি এক রাসূল পাঠিয়েছিলাম। (আল-মুযযামিল: ১৬)- অনুবাদক]- আয়াত পরিষ্কারভাবে বলছে, হযরত মূসা (আ.) যেভাবে তাঁর উম্মতের পাপ-পুণ্যের সাক্ষী ছিলেন সেভাবে আমাদের নবী (সা.)-ও সাক্ষী। কিন্তু খিলাফতের পদ্ধতি ছাড়া হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষে এরূপ দীর্ঘস্থায়ী সাক্ষী হওয়া সম্ভব হয় নি। অর্থাৎ সত্য পূর্ণরূপে উপস্থাপনের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য ১৪০০ বছর পর্যন্ত খলীফাদের ধারা নির্ধারণ করেছিলেন। যারা আসলে তওরাতের সেবক ও মূসা (আ.)-এর শরীয়তের সাহায্যকল্পে আসতেন যাতে আল্লাহ্ তা'লা এসব খলীফার মাধ্যমে হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষীর ধারাকে পূর্ণতা দান করেন আর কিয়ামত দিবসে তিনি যেন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সমস্ত বনী ইসরাঈল সম্পর্কে সাক্ষ্য দানের যোগ্য বলে বিবেচিত হন। অনুরূপভাবে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্

ইসলাম ধর্মের অনুসারী সকল মানুষের জন্য আমাদের নবী (সা.)-কে সাক্ষী বানিয়েছেন এবং বলেছেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

[অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি সাক্ষীরূপে এক রসূল পাঠিয়েছি (আল-মুযাম্মিল: ১৬) -অনুবাদক] আরো বলেছেন,

وَجُنُنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

[অর্থাৎ এবং আমরা তোমাকে তাদের ওপর সাক্ষী বানিয়াছি (আন-নিসা: ৪২)- অনুবাদক] কিন্তু এটি জানা কথা যে, দৈহিকভাবে মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতের মাঝে মাত্র ২৩ বছর ছিলেন। অতএব প্রশ্ন ওঠে, তাঁর উম্মতের জন্য তিনি কীভাবে স্থায়ী সাক্ষী হতে পারেন? বাস্তবতার নিরিখে এর উত্তর হলো, খিলাফতের মাধ্যমে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা মূসা (আ.)-এর মত মহানবী (সা.)-এর জন্যও কিয়ামত পর্যন্ত খলীফা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং খলীফাদের সাক্ষ্য হুবহু মহানবী (সা.)-এর সাক্ষ্যের অনুরূপ হবে। আর এভাবেই-

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

[অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি সাক্ষীরূপে এক রসূল পাঠিয়েছি। (আল-মুযাম্মিল: ১৬)- অনুবাদক]- আয়াতের বিষয়বস্তু সব দিক থেকে সঠিক সাব্যস্ত হয়েছে। মোটকথা পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে স্থায়ীভাবে সাক্ষী হবার বিশ্বাসটি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রমাণিত এবং সমস্ত মুসলমান কর্তৃক কেবল তখনই যৌক্তিক ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যখন চিরস্থায়ী খিলাফতকে মেনে নেওয়া হয়। আর এ বিষয়টি আমাদের কথাকে সত্য ও যথার্থ প্রমাণ করে, সুতরাং চিন্তা করো।

দ্বিতীয়ত মুহাম্মদী খিলাফতের সাথে মূসায়ী খিলাফতের পরিপূর্ণ সাদৃশ্য প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনকে আবশ্যিক সাব্যস্ত করে, যেভাবে নিম্নোক্ত আয়াত অর্থাৎ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

(আন-নূর: ৫৬)

(অর্থ: তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। -অনুবাদক)-এ বুঝা যায়। আয়াতটি সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করছে যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত মসীহ নামের একজন মুজাদ্দিদের আগমন আবশ্যিক। কেননা মুহাম্মদী খিলাফতের বিষয়টি মুসায়ী খিলাফতের বিষয়ের সাথে এ অবস্থাতেই পূর্ণ সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পারে যদি প্রাথমিক যুগ ও শেষ যুগ পরস্পর অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ হয় আর শেষ যুগের সাদৃশ্য দুটি বিষয়ে নিহিত ছিল। প্রধানত উম্মতের অবস্থার অধঃপতন হওয়া, পৃথিবীর সৌভাগ্যে ভাটা পড়া এবং ধর্মীয় সততা, ঈমানদারী ও তাকওয়ার ঘাটতি দেখা দেওয়া আর দ্বিতীয়ত এমন যুগে ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ নামে একজন মুজাদ্দিদের জন্ম নেওয়া, যিনি ঈমানী অবস্থাকে বহাল করবেন।

আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা প্রথম লক্ষণটি শুধু মনেই না, বরং মুসলমানদের পতন এবং এমন একটি ভিন জাতির উত্থান তারা স্বচক্ষে দেখছে যারা তাদের ধর্মকে সেভাবেই তুচ্ছতাচ্ছল্য ও হীনতর জ্ঞান করে যেভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে মাজুসী বা অগ্নি উপাসকেরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পর তাদের তুচ্ছতাচ্ছল্য ও অবজ্ঞা করত। এছাড়া তারা আরো দেখছে, মুসলমান আলেম সম্প্রদায় এবং জগৎমুখী সাধারণ মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ইহুদীদের অবস্থা হতে কোনো অংশে কম নয়, বরং সুস্পষ্টভাবে দ্বিগুণ বলে মনে হয়। আমরা যখন পবিত্র কুরআনের প্রথম পারাতেই ইহুদী মৌলভীদের সম্পর্কে পড়ি, ‘তোমরা লোকদেরকে পুণ্য ও সৎকর্মের উপদেশ দাও, কিন্তু নিজেদের বেলায় ভুলে যাও আর নিজ ভাইদের কষ্ট দেবার ক্ষেত্রে কোনো সুযোগই হাতছাড়া করো না এবং নানাবিধ লোভ-লালসা, অবৈধ কাজ, পাপাচার, ষড়যন্ত্র ও বস্তুবাদিতার ধোঁকায় মগ্ন আছো’ তখন এ হৃদয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, এ আয়াতগুলো আমাদের অধিকাংশ মৌলভীর ক্ষেত্রেও সত্য প্রমাণিত হচ্ছে।

অতএব আমাদের ভাইয়েরা নিজেরাই যখন ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত দুটি লক্ষণের একটির বর্তমান যুগে বিদ্যমান থাকার কথা মনে নিয়েছেন তখন অপর লক্ষণটি না মানা ঠিক তেমনই বিষয় যেভাবে কেউ বলে, ‘নিঃসন্দেহে সূর্য উঠেছে, কিন্তু এখনো সকাল হয় নি।’ যাহোক, কোনো ন্যায়পরায়ণ বিজ্ঞ লোকের পক্ষে একথা না মনে উপায় নেই যে, পবিত্র কুরআনের উক্ত

আয়াতের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে প্রমাণ হয়, মুহাম্মাদী খিলাফতের ধারা মুসায়ী খিলাফতের ধারার সাথে হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া উচিত যা كَامَا ‘কামা’ শব্দটি হতে বুঝা যায়। আর যখন হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া সাব্যস্ত হলো তখন এ উম্মতের মাঝেও এর শেষ যুগে, অর্থাৎ কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী যুগে হযরত ঈসার অনুরূপ কোনো খলীফার আগমন ঘটা উচিত; যিনি তরবারি নয় বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও কল্যাণরাজির মাধ্যমে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করবেন। হযরত ঈসা (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর ১৪০০ বছর পর এসেছিলেন, তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও মানতে হবে, বর্তমান যুগে প্রতিশ্রুত মসীহর আগমন আবশ্যিক। আল্লাহ তা’লা তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

অতএব এখন দেখা উচিত, এ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ হবার দাবিদার ক’জন আছেন। উদাহরণস্বরূপ যদি ধরেও নেওয়া হয়, বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্য থেকে ১০জন দাবি করেছেন তাহলে সেই ১০জনের মধ্যে থেকে একজন অবশ্যই সত্যবাদী এবং প্রতিশ্রুত মসীহ হবেন। কেননা আল্লাহ তা’লার নির্ধারিত নিদর্শন সত্যবাদীর অস্তিত্ব দাবি করে। কিন্তু কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী যেটি প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাবের যুগ সেই নিদর্শনের যুগে সিরিয়া, আরব, ইরাক, মিশর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের অধিবাসী ২০ কোটি মুসলমানের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তিই প্রতিশ্রুত মসীহ হবার দাবি করেছেন। অতএব এমন দাবিকারক যিনি তাঁর নির্ধারিত যুগে আবির্ভূত হয়েছেন তাকে মিথ্যা আখ্যা দিলে তো ভবিষ্যদ্বাণীও মিথ্যা সাব্যস্ত হয়।

চতুর্দশ শতাব্দীর শিরভাগে প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনের বিষয়টি কুরআন, হাদীস ও ওলী-আওলিয়াদের দিব্যদর্শন হতে এতো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যে দাবি যথাসময়ে ও যথোপযুক্ত পরিস্থিতিতে করা হয় তা প্রত্যাখ্যান করতে একজন মুত্তাকী ব্যক্তির গা শিউরে ওঠে। মোটকথা, এ অধর্মের সত্যতার প্রথম প্রমাণ হলো, রসূলদের নেতা (সা.), পবিত্র কুরআন ও আওলিয়াদের দিব্যদর্শন প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনের জন্য যে যুগকে নির্দিষ্ট করেছেন সেই যুগে দাবি করা। আমাদের নবী (সা.)-ই যখন শেষ যুগের নবী এবং সেই শেষ যুগের নবীর পরেও যখন আরো ১৩০০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন সেই হাদীস সম্বন্ধে ভেবে দেখুন! যাতে রো’ইয়া বা সত্যস্বপ্নে দেখা মিসরের ৭টি ধাপকে পৃথিবীর বয়স ৭ হাজার বছর বলে

উল্লেখ করা হয়েছে। খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, সেই হাদীসের আলোকে এ যুগ কি প্রতিশ্রুত মসীহর জন্য জরুরি নয়? পুনরায় **الْأَيُّتُ بِعَدِّ الْمِائَتَيْنِ** [অর্থাৎ ২০০ বছর পরের আলামত - অনুবাদক]- এই হাদীস নিয়েও ভেবে দেখুন যা থেকে আলেমরা হিসেব কষে বের করেছেন, কিয়ামতের বড়ো বড়ো নিদর্শনগুলো ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে প্রকাশ পেতে শুরু করবে। কেননা এ নিদর্শন দ্বারা যদি ছোটো ছোটো নিদর্শন বুঝানো হয় তাহলে এমতাবস্থায় বা'দাল মিয়াতাইনে, অর্থাৎ '২০০ বছর পর'-এর শর্তটি অপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। যেহেতু আমাদের নবী (সা.) নিজেই কিয়ামতের আলামতগুলোর একটি আলামত, তাই যদি এ হাদীসের অর্থ করা হয়, ২০০ বছর পরই আলামতে কুবরা বা বড়ো বড়ো লক্ষণাবলি প্রকাশ পেতে শুরু করবে তাহলে তা হবে পুরোপুরি ভুল অর্থ। কেননা ২০০ বছর পর তো কোনো আলামত প্রকাশ পাওয়া শুরু হয় নি। কাজেই আলেম সম্প্রদায় এই হাদীসে বর্ণিত 'মিয়াতাইন' বলতে সেই ২০০ বছরকে বুঝিয়েছেন যা হাজার বছর পরে আসবে, অর্থাৎ ১২০০ বছর পর আর আলেমদের এই ব্যাখ্যা সঠিক। কেননা এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বড়ো বড়ো সব ফিতনা-ফ্যাসাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং এ শতাব্দীতেই দাজ্জালিয়াতের তুফান ছড়িয়ে পড়েছে আর **مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ** [অর্থাৎ তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ধেয়ে আসবে (আল-আম্বিয়া: ৯৭)- অনুবাদক]-এর চিত্রও এ শতাব্দীতেই প্রকাশ পেয়েছে। শত শত ইসলামী রাষ্ট্র ধূলিসাৎ হয়ে গেছে আর খ্রিষ্টানরা ব্যাপকভাবে উন্নতি করেছে।

তৃতীয় সিদ্ধান্তের বিষয় হলো এ উম্মতের মাঝে সত্যিকার অর্থেই কোনো প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাবের কথা থাকলে এর কী প্রমাণ রয়েছে যে, এ অধমই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ? এ সম্পর্কে এখনই আমরা কুরআন শরীফের বেশ কয়েকটি যুক্তিপ্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছি যার পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিশেষ কোনো প্রমাণ চাইলে প্রশ্নকর্তাকে একটু ধৈর্যধারণ করতে হবে যেন আল্লাহ তা'লা নিজেই তাঁর বান্দার সমর্থনে যুক্তিপ্রমাণ নাযিল করেন। মূল কথা হলো, যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এমন দাবি পূর্ণরূপে প্রমাণ হওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ না দাবিকারকের স্বপক্ষে ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের প্রমাণ পাওয়া যায় আর আদিকাল থেকেই নবীদের জন্য আল্লাহ তা'লার এ রীতি চলমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে যদিও পূর্ব থেকেই আমাদের নেতা ও অভিভাবক মহানবী (সা.)

সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া ছিল আর মহানবী (সা.)-ও এমন যুগে আবির্ভূত হয়েছেন যে যুগ এক মহান রসূলের আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সত্য নবীর সত্যতা প্রমাণে পূর্ববর্তী বিভিন্ন ভবিষ্যদবাণীকে যথেষ্ট মনে করেন নি আর অন্যান্য নিদর্শনকেও যথেষ্ট মনে করেন নি, বরং সেই পরম পবিত্র নবীর সত্যায়নের জন্য অনেকগুলো ঐশী নিদর্শন অবতীর্ণ করেছেন। এক পর্যায়ে সেই মহান নবী (সা.)-এর সত্যতা সুস্পষ্ট হয়েছে এবং সূর্যের ন্যায় সত্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছে।

সুতরাং এভাবেই বুঝা উচিত, এ অধম যদি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং নিজ দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন দ্বারা এ অধমের সত্যতা প্রকাশ করে দেবেন আর নিজের বিশেষ বিশেষ সব নিদর্শনের মাধ্যমে জগদ্বাসীর কাছে সুস্পষ্ট করে দেবেন যে, এ অধম কোনো দুরভিসন্ধি করছে না, বরং তাঁর পক্ষ থেকেই আবির্ভূত হয়েছে। অতএব ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে নিজ দাবির সত্যতা প্রমাণ হবার পর অস্বীকার করার মতো আর কোনো কারণই অবশিষ্ট থাকতে পারে না, কেননা ঐশী নিদর্শন এমন জিনিস যার মাধ্যমে অনেক বড়ো বড়ো নবুওয়ত ও রিসালাত সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং ধর্মগ্রন্থগুলো যে আল্লাহ্ তা'লার বাণী তা-ও প্রমাণ হয়েছে; তাহলে এসবের মাধ্যমে মসীলে মসীহর বিষয়টি কেন প্রমাণ হবে না? মোটকথা, আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে তাঁর সত্যবাদী বান্দাদের সত্যতা প্রমাণ করেছেন, ঠিক একইভাবে এ অধমের সত্যতাও প্রমাণ করবেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুওয়ত মেনে নিতে ইহুদীদের কতটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা একবার ভেবে দেখা উচিত। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে লেখা ছিল, ঈসা রাজার বেশে আবির্ভূত হবেন, কিন্তু ঈসা এক হতদরিদ্রের বেশে জনগ্রহণ করেন। অতীতের কিতাবসমূহে উল্লেখ ছিল, তাঁর আগমনে ইহুদীদের সুদিন ফিরে আসবে। আর ইহুদীরা এ ভাবনায় বিভোর ছিল যে, তারা রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং ইসরাঈলের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে, কিন্তু বাস্তবে ঘটে এর উলটোটা আর ইহুদীরা আরো বেশি সমস্যা ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। অতীতের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে আরো লেখা ছিল, পৃথিবীতে ইলিয়াস নবীর পুনরাগমন না হওয়া পর্যন্ত তিনি আসবেন না।

তাই ইলিয়াস নবী আকাশ থেকে কবে নাযিল হবেন, সেই অপেক্ষায় ছিল ইহুদীরা? কিন্তু ইলিয়াস নবী নাযিল হলেন না অথচ হযরত ঈসা (আ.) দাবি

করে বসলেন, ‘আমিই প্রতিশ্রুত মসীহ’ এবং আরো বললেন, ‘ইয়াহুইয়া নবীই সেই ইলিয়াস নবী’। কিন্তু ইহুদীদের কাছে এ ব্যাখ্যা মনঃপূত হয় নি। বরং হযরত ইলিয়াসের নাযিলের জন্য তারা এমনভাবে অপেক্ষা করছিল, যেভাবে মুসলমানরা এখন হযরত ঈসার নাযিলের প্রতীক্ষায় রয়েছে। কিন্তু প্রবল বাধাবিপত্তির পরও আল্লাহ্ তা’লা তাঁর সত্য নবীকে বিনষ্ট করেন নি এবং অনেকগুলো নিদর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন, তিনি সত্য। যার ফলে সময়ের প্রয়োজনে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যে, তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ যাকে অবশেষে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

সুতরাং হে প্রিয় বন্ধুগণ! নিশ্চিতরূপে জেনে রাখো, সত্যবাদীর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা’লার চিরন্তন রীতিতে একটি পথই রয়েছে আর তা হলো, ঐশী নিদর্শন দ্বারা তিনি এটি প্রমাণ করে দেন যে, আল্লাহ্ তার সাথে আছেন এবং আল্লাহ্র সমীপে তিনি গৃহীত হয়েছেন। এখন ভেবে দেখুন! এ অধমের প্রতিশ্রুত মসীহ হবার দাবি হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ.)-এর দাবি অপেক্ষা বড়ো কিছু নয়। পুনরায় একটু ভেবে দেখুন! পৃথিবীতে এসব বুয়ূর্গ নবীকে কীভাবে গ্রহণ করা হয়েছে? ঐশী কল্যাণ এবং সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে নাকি অন্য কোনোভাবে? অতএব বুঝতে চেষ্টা করুন যে, আল্লাহ্ তা’লার চিরন্তন রীতিতে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন নেই। এ অধম যদি আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে না হয়ে থাকে এবং এগুলো যদি শুধুই প্রতারণা ও জালিয়াতিই হয়ে থাকে তাহলে পরিণতি শুভ হবে না। আল্লাহ্ তা’লা তাকে লাঞ্ছনার সাথে ধ্বংস করবেন এবং চিরকালের তরে অভিসম্পাত ও তিরস্কারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করবেন। কেননা এক ব্যক্তি দাবি করে, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে প্রত্যাдиষ্ট নয় এবং সে আরো বলে, আমি আল্লাহ্ তা’লার সাথে বাক্যালাপের মর্যাদা লাভ করেছি আর তাঁর বাণী আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় এবং আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হয় অথচ ‘কখনো আল্লাহ্ তা’লা তার সাথে বাক্যালাপ করেন নি আর আদৌ তার হৃদয়ে আল্লাহ্র বাণী অবতীর্ণও হয় নি এবং তার মুখ থেকে নিঃসৃতও হয় নি— এর চেয়ে বড়ো পাপ আর হতে পারে না।

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ وَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنَ الْمُخْذُولِينَ

(অর্থাৎ সাবধান! আল্লাহ্ তা’লার অভিসম্পাত এমনসব মিথ্যাবাদীর ওপর

যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে। আর তারা ইহজগৎ ও পরজগতে লাঞ্চিত হবে। -অনুবাদক)

কিন্তু এ অধম যদি আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আর তিনি যদি আমাকে প্রেরণ করে থাকেন এবং আমার প্রতি যে বাণী ইলহাম হয় তা যদি তাঁর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে কখনোই আমাকে বিনষ্ট করা হবে না আর আমি ধ্বংসও হবো না। বরং আল্লাহ তা'লা তাকেই ধ্বংস করবেন যে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং আমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। প্রতিশ্রুত মসীহ শব্দটিকে মানুষ কেন অদ্ভুত মনে করে এবং কেনইবা আমার নিকট এর প্রমাণ চায়?— একথা ভেবে আমি বিস্মিত হই। যদিও হযরত মূসার উন্মত সদৃশ এ উন্মতের মাঝেও ঈসার মতো কারো জন্ম হওয়া বিবেক পরিপন্থি কোনো বিষয় নয়। ‘আদম সন্তানের অস্তিত্ব বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান’— একথাটি দার্শনিকদের কাছেও স্বীকৃত। আর এটি আল্লাহর রীতি ও প্রকৃতির নিয়ম থেকেও প্রমাণিত, এ পৃথিবীতে কতক কতকের সদৃশ হিসেবে জন্ম নেয় এবং পুণ্যবানদের প্রতিরূপও জন্ম নেয় আবার পাপিদের প্রতিরূপও জন্ম নেয়। তবে হ্যাঁ! আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাदिষ্ট হবার প্রমাণ চাওয়া উচিত। কেননা এটি প্রমাণ হলেই বাকি সবকিছু প্রমাণিত হয়ে যায়। দেখুন! ‘আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) যখন লোকদের নিকট প্রকাশ করলেন, আমি মূসার মসীল বা প্রতিরূপ এবং আল্লাহ তা'লার রসূল’-এর দ্বারা তখন যাদের কাছে মহানবী (সা.)-এর রিসালাত বা নবুওয়ত প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল তাদের কাছে মহানবী (সা.)-এর মসীলে মূসা হবার বিষয়েও আর কোনো সন্দেহ থাকে নি। মহানবী (সা.)-এর রিসালাতের প্রতি তারা যেভাবে ঈমান এনেছে একইভাবে মসীল হবার বিষয়েও (ঈমান) এনেছে। অতএব আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত এবং সত্য ইলহামপ্রাপ্ত হবার প্রমাণই হলো সব প্রমাণের মূল প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ নবীর প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ হয় তার প্রতিটি বাক্যের প্রমাণ কেউ চায় না, বরং রিসালাত বা নবুওয়ত প্রমাণের মাধ্যমে সেসব ঘটনা এমনিতেই প্রমাণ হয়ে যায়। হে বন্ধুগণ! এমন বিষয় তো নয় যে, আল্লাহ তা'লা আমার জন্য পৃথক কোনো নিয়ম বানাতে চান! আদিকাল থেকে প্রচলিত আল্লাহ তা'লার নিয়মের প্রতি দৃষ্টি দিন এবং সে অনুযায়ী প্রশ্ন করুন।

এছাড়াও অদ্য ১১ রবিউল আউয়াল, ১৩১১ হিজরী মোতাবেক ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, মোতাবেক ৭ আশ্বিন ১৯৫০ বিক্রমাদিত্য সন রোজ

শুক্রবার পর্যন্ত এ অধম কর্তৃক তিন সহস্রাধিক নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। শত শত লোক এর সাক্ষী, বরং কোনো কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার বিষয়ে তো হাজার হাজার হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের বিরোধীরাও সাক্ষী রয়েছে। সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে, এমনও কিছু নিদর্শন আছে যেগুলোকে ইসলাম ধর্মের লাখ লাখ শত্রু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে এবং এখনো তারা জীবিত যারা এমন অসংখ্য নিদর্শন দেখেছে যা মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে। এছাড়া শত শত এমন লোকও রয়েছে যারা কোনো বিষয়ে দোয়া কবুল হবার পূর্বেই এর সংবাদ শুনেছে এবং এ বিষয়টিকে ঠিক সেভাবেই পূর্ণ হতে দেখেছে যেভাবে বলা হয়েছিল। ভারত, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া ও রোমের গুপ্তি, ইহুদীদের ফকীহ, মাজুসী বা অগ্নি উপাসকদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং খ্রিষ্টানদের পাদরি, যাজক ও বিশপদের মধ্যে থেকেও এমন প্রায় ষোলো হাজারের মতো লোক আছেন যাদের কাছে রেজিস্ট্রি ডাক যোগে পত্র পাঠানো হয়েছে, যাতে লিখা হয়েছে, পৃথিবীতে ইসলামই প্রকৃত সত্য ধর্ম এবং অন্য সব ধর্ম তাদের আদিরূপ (Originality) ও বিশুদ্ধতা হতে অনেক দূরে সরে গেছে। বিরুদ্ধবাদী কারো যদি সন্দেহ থাকে তাহলে যেন সে আমার কাছে এসে এক বছর অবস্থান করে এবং আমার কাছে থেকে ইসলামের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে। আর আমরা যদি ভ্রান্ত প্রমাণিত হই তাহলে সে যেন আমাদের কাছ থেকে জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে তার এক বছরের খরচ নিয়ে নেয়। অপরদিকে তার কাছে আমরা ইসলাম গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই চাই না। আশ্বস্ত হবার নিমিত্তে সে চাইলে এই টাকা কোনো ব্যাংকে জমা করিয়ে নিতে পারে কিন্তু এতে কেউই সাড়া দেয় নি।

এখন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ভেবে দেখতে পারে, এ অধম যদি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের প্রতি এমন দৃঢ়বিশ্বাসী না হতো যা ক্রমাগত অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ফলে সৃষ্টি হয় তাহলে ইসলামের এমন সব বিরুদ্ধবাদী, অর্থাৎ বিশ্বের বুকে যারা ঘোর ধর্মবিরোধী এবং স্বজাতির নেতা তাদের বিরুদ্ধে একা এক ব্যক্তির দণ্ডায়মান হওয়া কীভাবে সম্ভব? একথা সুস্পষ্ট যে, দুর্বল একজন মানুষ নিজ সত্তায় কখনোই এমন শক্তি রাখে না যে, সে সমগ্র বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াবে। একই সাথে নিজের দৃঢ়বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ছাড়া কী এমন ছিল যা এ অধমকে এ ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার সাহস জুগিয়েছে? শুধু মৌখিকভাবেই নয়, বরং এসব বিজ্ঞাপন

ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় ছাপতে এবং সেগুলোকে ভারতবর্ষ ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রেজিস্ট্রি ডাক যোগে প্রেরণ করতে প্রায় ২০০০/- (দুই হাজার রূপি) ব্যয় হয়েছে [এটি আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগের কথা।— অনুবাদক]। কিন্তু মোকাবিলা করার সাহস কারো হয় নি। শত্রুদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হওয়াটাও একটি নিদর্শন ছিল। সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে বর্তমান যুগের কোনো পাদরি এবং অন্যদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, তাদের কাছে কি রেজিস্ট্রি ডাক যোগে ইসলামের দাওয়াত-সংবলিত পত্র পৌঁছে নি?

অতএব ভেবে দেখুন! যে ব্যক্তি কয়েক হাজার রূপি শুধু বিজ্ঞাপন ছাপাতে ও সেগুলো প্রেরণ করতে ব্যয় করে এবং শত্রুদের জন্য তাদের বিজয় সাপেক্ষে পুরস্কার হিসেবে মোটা অঙ্কের অর্থ ঘোষণা করে, এমন ব্যক্তির দাবি কি যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিছক মিথ্যা, ধোঁকা ও প্রতারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? আজ পর্যন্ত কি এমন কোনো প্রতারকের কথা পৃথিবীর কোনো পুস্তকে পড়া হয়েছে, না শোনা গেছে আর না দেখা গেছে? থাকলে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন। হে বন্ধুরা! নিশ্চিত জেনে রাখুন, কারো সাথে আল্লাহ্ না থাকলে তার মাঝে কখনোই এমন দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও বদান্যতা সৃষ্টি হতে পারে না। এ যুগের কোনো মৌলভীকে কেউ কি কখনো দেখেছে বা তার সম্পর্কে শুনেছে যে, সে ইসলামের দাওয়াত দিতে কোনো ইংরেজ সহকারী কমিশনার বা (A.D.C.)-কেই চিঠি দিয়েছে? কিন্তু এখানে শুধু এতটুকুই নয়, বরং লন্ডনের সংসদ, ভবিষ্যৎ বাদশাহ যুবরাজ প্রিন্স বিসমার্কের কাছেও ইসলামের দাওয়াত-সংবলিত বিজ্ঞাপন ও চিঠিপত্র প্রেরণ করা হয়েছে, যেগুলোর রশিদ এখনো সংরক্ষিত আছে। প্রায় দশ বছর পূর্বে প্রকাশিত এসব বিজ্ঞাপনে এটিও লেখা ছিল যে, এ অধম হযরত জঁসা ইবনে মরিয়মের সাথে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে সাদৃশ্য রাখে।

একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য এ অধমের সত্যতার বিষয়ে এটিও আরেকটি প্রমাণ। কেননা মসীলে মসীহর দাবি যদি শুধুই মানবীয় অভিসন্ধি হতো এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কোনো ইলহাম না হতো তাহলে প্রতিশ্রুত মসীহ দাবি করার দশ বছর, বরং বলা উচিত বারো বছর পূর্বেই নিজে থেকে সেই দাবির স্বপক্ষে ধারাবাহিকভাবে ইলহাম প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। কেননা 'যে কাজ বা দাবি বারো বছর পর করা হবে তার ভিত্তি এর পূর্বেই রচনা করার মতো দূরদর্শিতা প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের

মাঝে নেই’- এটি সবাই বুঝতে পারে। সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় হলো, এমন সীমালঙ্ঘনকারী প্রতারককে আল্লাহ তা’লা এত সুদীর্ঘ অবকাশ দিয়েছেন যে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত বারো বছর অতিবাহিত হয়েছে। প্রতারক তার প্রতারণার ক্ষেত্রে এতটা দুঃসাহসী যে, সে পূর্ব থেকেই পণ করে রেখেছিল বারো বছর পর আমি এমন দাবি করব। আর ‘অবশ্যই আমি মসীলে মসীহ’- এ দাবির ভিত্তি সে বারো বছর পূর্বেই রচনা করেছে।

শুধুমাত্র এতটুকুই নয়, বরং ইলহামের বরাত টেনে নিজে থেকে সেই মসীলে মসীহ আখ্যা দিয়েছে আর উৎকর্ষের দিক থেকেও সে তাঁর মতো হবার দাবি করেছে এবং আংশিকভাবে সে তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলির ধারক বলে মনে করেছে। আর এতেও সে ক্ষ্যান্ত হয় নি, বরং নিজের মসীহ হিসেবে দাবির বারো বছর পূর্বেই সে তার পুস্তক, অর্থাৎ বারাহীনে আহমদীয়াতে প্রকাশ্যে ও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছে যে, আল্লাহ তা’লা আমার নাম ‘ঈসা’ রেখেছেন এবং আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ‘আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দেবো, এরপর তোমাকে আমি আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং অস্বীকারকারীদের সমস্ত অপবাদ থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করব আর তোমার অনুসারীদের আমি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করব।’ আর আল্লাহ তা’লা তাকে শুধু সুযোগই দেন নি, বরং ইলহামী নিদর্শনাবলির মাধ্যমে তাকে সাহায্যও করেছেন এবং তার জন্য একটি জামা’ত গঠন করে দিয়েছেন। অথচ পবিত্র কুরআনে তিনি নিজেই বলেছেন, ‘আমি কোনো মিথ্যাবাদী প্রতারককে সাহায্য করি না এবং অচিরেই তাকে ধ্বংস করা হয়’ আর তার জামা’তকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়। বরং নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে তিনি বলেছেন, তুমি যদি তিল পরিমাণও প্রতারণা করতে তাহলে তোমার জীবন শিরা কেটে দেওয়া হতো।

অতএব একথা যদি সত্য না হয় যে, মিথ্যা রসূল সেজে যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্টি, অর্থাৎ মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, এমন প্রতারককে আল্লাহ তা’লা অচিরেই পাকড়াও করেন তাহলে এ অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর ক্ষেত্রেও এ প্রমাণ উপস্থাপন করা نُوذُ بِاللّٰهِ (আমরা আল্লাহ তা’লার আশ্রয় প্রার্থনা করছি- অনুবাদক) সঠিক হতে পারে না, অর্থাৎ نُوذُ بِاللّٰهِ মহানবী (সা.) যদি মুফতারী বা প্রতারক হতেন তাহলে আল্লাহ তা’লা তাঁকে পাকড়াও করতেন। অতএব সুদীর্ঘ এ অবকাশ এবং আল্লাহ তা’লার শত শত সাহায্য-সমর্থন ও শত শত

নিদর্শন সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদীরা এ অধর্মের বিরুদ্ধে শাস্তি কামনা করে অসংখ্য দোয়া করেছে। তারা তাদের মুবাহেলাতেও কেঁদে কেঁদে এই অধর্মের প্রতি শাস্তি কামনা করেছে, কিন্তু তাদের ভাগ্যে অপমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই জোটে নি। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ জানেন, কোনো মুবাহালায় আমরা কোনো শত্রুর শাস্তি কামনা করি নি। আর অমৃতসরে মুবাহালাকারী সেই আব্দুল হক গাজনভীর মৃত্যুর জন্যেও আমি বদ দোয়া করি নি। কিন্তু সে অনেক আহাজারি করেছিল। অথচ মুবাহেলাতেও আমরা চেয়েছিলাম এবং আজও চাই যেন এ অধর্মের সমর্থনে সর্বজনীন ঐশী নিদর্শনাবলি প্রকাশিত হয় আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সর্বক্ষেত্রে বিজয়ী করলে সেটাই হবে বিরুদ্ধবাদী মুবাহালাকারীর লাঞ্ছনা ও অপমানের জন্য যথেষ্ট। মোটকথা, এ সবই সত্যতার নিদর্শন, কিন্তু তার জন্য যে গভীরভাবে চিন্তা করে।

পরিতাপের বিষয় হলো, আমাকে বার বার প্রশ্ন করা হয়, আপনার প্রতিশ্রুত মসীহ হবার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ কী? কিন্তু এমন লোকেরা বুঝে না যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতিশ্রুত হবার এবং আমাদের নবী (সা.)-এর প্রতিশ্রুত খাতামুন নাবিয়ীন হবার কী প্রমাণ ছিল? প্রমাণ কি এটিই ছিল না যে, আল্লাহ্ তা'লা অসংখ্য নিদর্শনের মাধ্যমে তাদের সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন? যদিও ইহুদীরা হযরত মসীহকে মেনে নেয় নি এবং আজ অবধি বলছে, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ ছিলেন না, তথাপি তার আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হবার বিষয়টি বিভিন্ন মুজিয়া ও নিদর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে গেছে*। প্রধানত সত্যবাদী (নবী) এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হবার ক্ষেত্রে প্রমাণ চাওয়া হয় কিন্তু মসীল

* টীকা: হেদায়াতুল্লাহ্ নামের এক ভদ্রলোক এ অধর্মের বিরুদ্ধে ঈসা (আ.)-এর নিদর্শনাবলি অস্বীকারের অভিযোগ উত্থাপন করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি তার ধারণা অনুযায়ী আমার ‘ইযালায়ে আওহাম’ পুস্তকের কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলতে চেয়েছেন, নাউযুবিল্লাহ্ আমি নাকি শুরু থেকেই হযরত ঈসা (আ.)-এর বিভিন্ন নিদর্শনের অস্বীকারকারী। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এটি এমন লোকদের দেখা ও বুঝার ভুল। আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর মুজিয়া প্রদর্শনের কথা অস্বীকার করি না। নিঃসন্দেহে তাঁর দ্বারাও কিছু নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। যদিও ইনজীল ঘেঁটে দেখলে (যে-সব নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায় তা) তাঁর মুজিয়ায় ঘণ্য ধরনের কলঙ্ক লেপন করে, যেমন পুকুরের গল্প এবং তাঁর নিজের বার বার অস্বীকার করা যে, আমি মুজিয়া দেখাতে পারি না। সত্য কথা হলো ইনজীলের কথায় আমাদের কি আসে যায়! পবিত্র

তথা সদৃশ হবার প্রমাণ এর অধীনেই এসে যায়। এছাড়াও বিদ্যমান সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বজ্রকণ্ঠে এ ঘোষণাই দিচ্ছে যে, এ শতাব্দীর মুজাদ্দিদকেই

* **চলমান টীকা:** কুরআন থেকে অবশ্যই প্রমাণিত হয়, তাঁকে কিছু নিদর্শন দেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ! এটি আমাদের অদূরদর্শী আলেমদের ভুল, কেননা তাঁর সম্পর্কে তারা ধারণা করে, বিশ্বজগতের স্রষ্টার মতো তিনিও কোনো প্রাণীর কাঠামো তৈরি করে তাতে (জীবনীশক্তি) ফুঁকে দিতেন আর সেটি জীবিত হয়ে উড়ে যেত।

এছাড়া মৃতদেহে হাত রাখতেন আর সে জীবিত হয়ে চলাফেরা করা শুরু করত। তাঁর মাঝে অদৃশ্য বিষয় জ্ঞাত হবার ক্ষমতাও ছিল। অদ্যাবধি তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি বরং সশরীরে আকাশে অবস্থান করছেন। তার প্রতি যে-সব কথা আরোপ করা হয়েছে তা যদি সঠিক হয় তাহলে তার বিশ্বজগতের স্রষ্টা, আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য জ্ঞাতা) এবং মৃতের জীবনদাতা হবার ক্ষেত্রে কি সন্দেহ থাকতে পারে? অতএব এ অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো খ্রিস্টান যদি ‘কোনো বস্তুর আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি সেই বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে’- একথার ভিত্তিতে (এ বিশ্বাসকে) তার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে তাহলে আমাদের মুসলমান ভাইদের কাছে এর কোনো উত্তর আছে কি? যদি বলেন, দোয়ার ফলে এ ধরনের অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল তাহলে এটি হবে ঐশী বাণীতে সংযোজন।

কেননা পবিত্র কুরআন থেকে বুঝা যায়, যেমন- ফুঁ দিলে পাখির আদলে বানানো বস্তু উড়তে আরম্ভ করত। কুরআন শরীফের কোথাও তো দোয়ার কথা উল্লেখই নেই এবং একথারও কোনো উল্লেখ নেই যে, ‘পাখির আকৃতির মাঝে আসলেই প্রাণ সঞ্চারিত হতো’। নিজের পক্ষ থেকে ঐশী বাণীতে কোনো কিছু যোগ করা উচিত নয়, কেননা এর নামই তো প্রক্ষেপণ; যার জন্য ইহুদীদের অভিসম্পাত করা হয়েছে। অতএব যে অবস্থায় প্রাণ সঞ্চারের বিষয়টি প্রমাণিত নয় বরং ‘মাআলিমুত তানযীল’ এবং অন্য আরো অনেক তফসীর থেকে এটিই প্রমাণ হয় যে, সেই পাখির আকৃতির (বস্তু) কিছুক্ষণ ওড়ার পর পুনরায় মাটির মতোই ভূমিতে আছড়ে পড়ত। কাজেই এছাড়া আর কিছু মনে করার কারণ নেই যে, তা আসলে মাটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর মাটির বিভিন্ন খেলনা যেভাবে মানুষের তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে চলাচল করে একইভাবে তা এক নবীর আত্মিক প্রভাবের ফলে উড়ত। অন্যথায় সত্যিকার স্রষ্টা জ্ঞান করলে আবশ্যিকভাবে মহাবিপত্তি দেখা দেবে আর এটি শিরক করা বইকি। মুজিয়া হলো মূল উদ্দেশ্য। আর জড়বস্তুর নিষ্প্রাণ হওয়া সত্ত্বেও উড্ডয়ন করাই তো অনেক বড়ো মুজিয়া।

হ্যাঁ! কুরআন শরীফের কোনো কিরাতে যদি এ স্থানে, অর্থাৎ ‘অতঃপর তা জীবিত হয়ে যায়’ শব্দ থেকে থাকে অথবা ঐতিহাসিকভাবেও যদি প্রমাণ হয় যে, আসলেই তা জীবিত

প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র বাণী প্রতিশ্রুত মসীহর যুগের জন্য যে-সব লক্ষণ নির্ধারণ করেছে তার সবই এ যুগে পূর্ণ হয়েছে। আপনারা কি দেখছেন না, খ্রিষ্টান সাম্রাজ্য সারা পৃথিবীর দেশগুলোকে গ্রাস করেছে এবং সকল প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব তাদের হাতের মুঠোয় আর

مِنْ كُلِّ حَذَابٍ يُنْسَلُونَ

[অর্থাৎ তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ধৈর্যে আসবে (আল-আম্বিয়া: ৯৭)- অনুবাদক]-এ আয়াতের সত্যায়নকারী। হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে ইহুদীদের যেরূপ দূরবস্থা ছিল তেমনই শোচনীয় অবস্থা ধর্মীয় ও জাগতিকভাবে ইসলামেরও হয়েছে। যেভাবে ঈসা (আ.) এমন এক সময়ে এসেছিলেন যখন ধর্মের জন্য তরবারি ধারণ করা পুরোপুরি অসংগত ছিল। এর কারণ, নিজেদের অসদাচরণের জন্যই ইহুদীরা তাদের দেশ হারিয়েছিল আর রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র দখলে এমন কোনো দোষ ছিল না যার জন্য তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যায়। বর্তমানেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। কেননা মুসলমান রাজাবাদশারা স্বৈরাচারী করে এবং অনৈতিক বিলাসিতায় মত্ত হয়ে নিজেদের রাষ্ট্র হারিয়েছে। বরং তাদের মাঝে রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো যোগ্যতাই আর অবশিষ্ট নেই, তাই আল্লাহ্ তা'লা (সেই) রাষ্ট্র ইংরেজদের দিয়ে দিয়েছেন আর রাষ্ট্র নিয়ে তারা কোনো অন্যায় করে নি। তারা কারো নামায-রোযা বন্ধ করে নি, কাউকে হজ্জে যেতে বাধা দেয় নি। বরং সর্বসাধারণের স্বাধীনতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। অতএব তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে পরম দয়াময় ও করুণাময় আল্লাহ্ অস্ত্রধারণের আদেশ কীভাবে

* চলমান টীকা: হতো, ডিমও পাড়তো এবং সেই প্রজাতির পাখি এখনো পাওয়া যায় তাহলে এর প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বিশ্বের সবাই মিলেও যদি একটি মাছি বানাতে চায় তবুও তারা তা বানাতে পারবে না। কেননা এর ফলে আল্লাহ্র সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ‘আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে স্রষ্টা হবার অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন’- একথা বলা তো আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা। ঐশী বাণীতে স্ববিরোধ নেই এবং আল্লাহ্ তা'লা কাউকে এমন অনুমতিও দেন না। নবীদের নেতা মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যখন একটি মাছি বানানোরও অনুমতি দেন নি তখন মরিয়ম পুত্র ঈসা কীভাবে এ অনুমতি পেতে পারেন? আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করুন এবং রূপক বিষয়কে আক্ষরিক রূপ দেবেন না। -লেখক

দিতে পারেন? ধর্ম প্রসারের জন্য তাঁর কাছে কি মাধ্যম হিসেবে শুধু বাহ্যিক অস্ত্রই ছিল আর আধ্যাত্মিক কোনো অস্ত্র ছিল না? অধিকন্তু অস্ত্রের ঈমানে এখন আর কোনো বিশ্বাস নেই। অস্ত্রের বলে ইংরেজরা কাউকে নিজ ধর্মে ধর্মান্তরিত করে নি, যার জন্য ‘ইটের বদলে পাটকেল’ দিয়ে এর উত্তর দিতে হবে। বরং মানুষ তো নতুন দর্শন, নতুন প্রাকৃতিক বা বিজ্ঞানের জ্ঞান আর পাদরিদের কুমন্ত্রণায় ধ্বংস হয়েছে।

অতএব মানুষের ওপর তরবারি না চালিয়ে, বরং ইসলামের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপনই এর উত্তর। কাজেই, আল্লাহ তা’লা মুসলমানদের অবস্থা ইহুদীদের অনুরূপ পেয়ে তাদের জন্য হযরত মসীহ সদৃশ ঢাল-তলোয়ার ও তিরধনুক বিহীন এক সংস্কারক প্রেরণ করেছেন এবং দাজ্জালিয়াত দূর করতে সেই সংস্কারককে শুধু ঐশী অস্ত্র দিয়েছেন। যেভাবে عِيسَىٰ عِندَ مَنَازَةِ دَمَشْق [ঈসা দামেস্কের মিনারের পাশে অবতরণ করবে -অনুবাদক]-এর শব্দগুলোর (গাণিতিক) মান ১৪০০ সেভাবে প্রতিশ্রুত মসীহও চতুর্দশ শতাব্দীর শিরভাগেই এসেছেন। এছাড়া

اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَبَّآ يَّحْفُوْا بِهٖم

[অর্থাৎ এবং তাদের মাঝেও যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি (আল-জুমুআ: ৪) -অনুবাদক] আয়াতের বর্ণগুলোর সাংখ্যমান গণনা করলে যেভাবে ১২৭৫ সংখ্যাটি সামনে আসে আর ঠিক এ যুগেই তাকে মানুষের সংশোধনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর যেভাবে পবিত্র কুরআন সুসংবাদ দিয়ে বলেছে, খ্রিষ্টানদের প্রবল নৈরাজ্যের যুগে শিঙা বাজানো হবে, তাঁর আগমন সেভাবেই ঘটেছে এবং তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই আল্লাহ তা’লার কিছু প্রিয় বান্দা ইলহাম পেয়ে তাঁর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন। বরং কেউ কেউ তাঁর আবির্ভাবের ৩২ বছর পূর্বেই তাঁর নাম জানিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, ইনিই প্রতিশ্রুত মসীহ আর মরিয়ম তনয় ঈসা মারা গেছেন। অনেক দিব্যদর্শী চতুর্দশ শতাব্দীকেই প্রতিশ্রুত মসীহর আগমনের যুগ বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁদের ইলহামগুলো লিখে গেছেন। এখন এত কিছুর পরও এমন বিষয় প্রমাণের জন্য আর কী প্রমাণ দরকার অথচ এমন বিষয়ে ‘ঈমান বিল গায়েব’ তথা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমানেরও কিছু সুযোগ সংকুলান রাখা উচিত?

এছাড়া এ অধর্মের পক্ষ থেকে আরো কতিপয় মহানিদর্শন প্রকাশের

অপেক্ষায় আছে। যেমন মুসী আব্দুল্লাহ্ আথম অমৃতসরী সাহেব সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, যার মেয়াদ ৫ জুন ১৮৯৩ হতে ১৫ মাস পর্যন্ত, পণ্ডিত লেখরাম পেশওয়ারীর মৃত্যু সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, যার মেয়াদ ১৮৯৩ হতে ৬ বছর এবং লাহোর জেলার পণ্ডিত নিবাসী মির্যা আহমদ বেগ হুশিয়ারপুরীর জামাতার মৃত্যু সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, যার মেয়াদ অদ্য ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ইং তারিখ হতে প্রায় ১১ মাস বাকি রয়েছে। নিশ্চিতরূপে মানবীয় শক্তির উর্ধ্বের এ বিষয়গুলো একজন সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদীকে শনাক্ত করার জন্য যথেষ্ট। কেননা জন্ম ও মৃত্যু এ দুটো বিষয়ই আল্লাহ্ তা'লার হাতে আর তাই কোনো ব্যক্তি পরম প্রিয়পাত্র না হলে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য তার কোনো শত্রুকে তার দোয়ার ফলে ধ্বংস করতে পারেন না। বিশেষ করে এমতাবস্থায় যখন সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হবার দাবি করে এবং সেসব অলৌকিক নিদর্শনকে নিজ সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। কাজেই ভবিষ্যদ্বাণী কোনো সাধারণ বিষয় নয় এবং মানুষের আয়ত্তাধীন বিষয়ও নয়, বরং শুধু মহাপ্রতাপাশ্বিত আল্লাহ্র আয়ত্তাধীন। অতএব যদি কোনো সত্যাস্থেষী থেকে থাকেন তাহলে এসব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এ তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীই ভারতবর্ষ তথা পাঞ্জাবের বড়ো তিনটি জাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ একটি মুসলমানদের সাথে, একটি হিন্দুদের সাথে এবং একটি খ্রিষ্টানদের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর মধ্যে মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এর অংশগুলো হলো—

১. মির্যা আহমদ বেগ হুশিয়ারপুরী যেন ৩ বছর মেয়াদের মধ্যেই মারা যায়।

২. এরপর যেন তার সেই জামাতা আড়াই বছরের মধ্যে মারা যায় যে তার বড়ো মেয়ের স্বামী।

৩. এছাড়া মির্যা আহমদ বেগ যেন তার বড়ো মেয়ের বিয়ের দিন পর্যন্ত মারা না যায়।

৪. সেই মেয়েও যেন বিয়ের পর বিধবা হয় এবং দ্বিতীয় বিয়ের পূর্বে মারা না যায়।

৫. আর এ অধমও যেন সেসব ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত মারা না যায়।

৬. আর এরপর যেন এ অধমের সাথে বিয়ে হয়। আর একথা সুস্পষ্ট যে, এসব ঘটনা মানুষের সাধ্যের উর্ধ্বের।

মিয়ার আতা মুহাম্মদ সাহেবের জন্য এসব প্রমাণ যদি এখনো যথেষ্ট না হয় তাহলে (তার জন্য) সহজ পদ্ধতি হলো, পুরো পুস্তিকাটি মনোযোগের সাথে পাঠের পর তিনি যেন আমাকে ছাপানো কোনো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অবগত করেন, এসব বিষয়ে আমি আশ্বস্ত হতে পারি নি এবং এখনো আমি প্রতারণাই মনে করছি। আর আমি চাই, আমার সম্পর্কেও যেন কোনো নিদর্শন প্রদর্শিত হয়। তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ চাইলে, আমি তার বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করব এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কোনো বিরুদ্ধবাদের বিপরীতে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পরাজিত করবেন না। কেননা আমি তাঁর পক্ষ থেকে এবং তাঁরই নির্দেশে তাঁর ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে এসেছি। কিন্তু তার উচিত, তিনি যেন আমাকে তার বিজ্ঞাপনে মোটের ওপর অনুমতি দিয়ে দেন যে, তার সম্পর্কে আমি যে ধরনের ইলহামই পাবো তা যেন প্রকাশ করতে পারি। আমি তো বিস্মিত হই (যখন দেখি), কোনো মুজাদ্দিদের আবির্ভাবের সময় মুসলমানদের যেখানে আনন্দিত হওয়া উচিত সেখানে এত উৎকণ্ঠা কেন?

এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ধর্মের স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের জন্য এক ব্যক্তিকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন, তাদের কাছে এটি খারাপ লাগছে কেন? কিন্তু আমি বুঝে গেছি যে, বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলমানের ঈমানের অবস্থা খুবই খারাপ এবং বর্তমান যুগের দর্শনের বিষয় তাদের ঈমানের চরম সর্বনাশ করেছে। মুখে ইসলামের কথা বললেও তাদের হৃদয় পড়ে আছে ইসলাম থেকে বহু দূরে। তাদের দৃষ্টিতে ঐশ্বরিক কর্মকাণ্ড এবং ঐশী শক্তিমত্তা হাস্যকর বিষয়। মিয়ার আতা মুহাম্মদ সাহেবের অবস্থাও অভিন্ন। আমার মনে আছে, অমৃতসরে জনাব আব্দুল্লাহ্ আথম সাহেবকে যখন তার মৃত্যু সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী শোনানো হয় তখন মিয়ার আতা মুহাম্মদ আমার মঞ্চে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উদাহরণ দিয়ে বলে, এক ডাক্তার আমার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিল, অর্থাৎ এত দিনের মধ্যে আতা মুহাম্মদ মারা যাবে। কিন্তু সেই নির্ধারিত সময় ভালোয় ভালোয় কেটে যাবার পর আমি ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়ে তাকে সালাম দেই, উত্তরে তিনি বলেন, আপনি কে? প্রত্যুত্তরে আমি বলি, আমি সেই আতা মুহাম্মদ যার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী আপনি করেছিলেন। তার একথার উদ্দেশ্য হলো, এ সবই মিথ্যা এবং নিরর্থক বিষয়। কিন্তু মিয়ার আতা মুহাম্মদ সাহেবকে স্মরণ রাখতে হবে, এখানে ডাক্তারের উদাহরণ দেওয়া কেবল এটিই প্রমাণ করে যে, ঐশী জ্যোতির বিষয়ে তিনি

পুরোপুরি অজ্ঞ। নিঃসন্দেহে এমন এক সত্তা আছেন যার নাম আল্লাহ, তিনি তাঁর সত্য ধর্মের সাহায্যকল্পে শুধু নির্দিষ্ট কোনো যুগেই নয় বরং প্রয়োজনের সময় সর্বদা ঐশী নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন এবং বিশ্ববাসীর ঈমানকে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ডাক্তারের উদাহরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, সেই আল্লাহর প্রতি আপনার কতটা ঈমান আছে? এখন আমি এখানেই এ পুস্তিকার ইতি টানা সংগত মনে করছি।

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْلَىٰ وَأَخْرَأَ وَظَاهَرًا وَبَاطِنًا هُوَ مَوْلَانَا نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ-

[অর্থাৎ অতএব এর শুরু ও সমাপ্তিতে এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার, তিনিই আমাদের অভিভাবক। তিনি কত-না উত্তম অভিভাবক এবং কত-না উত্তম সাহায্যকারী ॥ -অনুবাদক।]

লেখক

অধম গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ ইং, রোজ শুক্রবার

সরকারের মনোযোগের দাবি রাখে

এ অধম সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় নিবেদন করছে, যেহেতু আমার সম্মানিত পিতা মরহুম মির্ষা গোলাম মুর্তজা সাহেবের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই পরিবার ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহভাজন হয়ে এসেছে তাই কৃত্রিমতা বা লৌকিকতা প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং আমার শিরা-উপশিরায় সম্মানিত এ সরকারের কৃতজ্ঞতা (রক্ত প্রবাহের মতো) প্রবহমান। এ সরকারের কল্যাণার্থে নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে কৃত সেবাগুলো আমার মরহুম পিতার জীবনী হতে কিছুতেই পৃথক করা যাবে না। তিনি তাঁর যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন অবস্থায় ও প্রয়োজনে সেবার ক্ষেত্রে সর্বদা এমন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন যে, কোনো মানুষ পরম নিষ্ঠা ও হৃদয়ের গভীর থেকে কারো হিতৈষী না হলে এমনটি করতে পারে না। ৫৭ সনের বিদ্রোহের সময় দুষ্ট লোকেরা যখন হিতৈষী এ সরকারের বিরোধিতায় দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তখন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা নিজের পক্ষ থেকে ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে ৫০জন অশ্বারোহীসহ সরকারের সমীপে উপস্থাপন করেন, এরপরও একবার ১৪জন অশ্বারোহী দিয়ে সহায়তা করেন। এসব নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার জন্য তিনি এ সরকারের প্রিয়ভাজন হন। ফলে সম্মানিত গভর্নর জেনারেলের কার্যালয়ে তাঁকে সম্মানের সাথে আসন দেওয়া হতো এবং সর্বস্তরের ইংরেজ কর্মকর্তারা তাঁর সাথে খুবই সম্মানজনক ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করত। শুধু সরকারের সেবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমার ভাইকে কয়েকটি যুদ্ধে পাঠিয়েছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সরকারের সম্ভৃতিভাজন হয়েছেন। সারাটা জীবন তিনি সুনামের সাথে কাটিয়ে নশ্বর এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এরপর এ অধমের ভাই মির্ষা গোলাম কাদের যতদিন জীবিত ছিলেন তিনিও তার মরহুম পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এবং সরকারের নিষ্ঠাপূর্ণ সেবায় পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে রত ছিলেন। এরপর তিনিও ধরাধাম ত্যাগ করেন। আশা করি, এখনো এমন অনেক ইংরেজ কর্মকর্তা জীবিত আছেন যারা আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে দেখেছেন এবং তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার চাক্ষুষ সাক্ষী হবেন আর মিস্টার গ্রীফেন তাঁদেরই একজন, যিনি পাঞ্জাবের জমিদারদের সম্বন্ধে একটি পুস্তকও রচনা করেছেন। আর এতে তিনি শ্রদ্ধার সাথে ও প্রশংসনীয় ভাষায় আমার শ্রদ্ধেয় পিতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

এসব প্রিয়জন এবং জ্যেষ্ঠজনদের মৃত্যুর পর বর্তমানে আমার অবস্থা

এমন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়কে জগৎবিমুখ করে দিয়েছেন আর আমিও চাই, আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমার সম্পর্ক যেন পুরোপুরি সততা ও নিষ্ঠাপূর্ণ এবং প্রেমময় হয়। অতএব তিনি আমার হৃদয়কে তাঁর ভালোবাসায় পূর্ণ করে দিয়েছেন, কিন্তু তা আমার নিজ প্রচেষ্টায় নয় বরং তাঁর স্বীয় অনুগ্রহে করেছেন। এ অবস্থায় আমি চাইলাম, তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশী প্রেমে যথাসাধ্য উন্নতি করতে এবং আল্লাহ্ কে আর কীসে তাঁর সম্বন্ধি নিহিত তা সঠিকভাবে জেনে নিতে। কাজেই আমি আমার হৃদয়কে সব ধরনের বিদ্রোহ হতে পবিত্র করলাম, চোখকে সকল কলুষ থেকে মুক্ত করে দেখলাম এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলাম আর তখনই আমার কাছে প্রকাশিত হলো আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র ইলহাম দ্বারা আমাকে অবগত করলেন, আল্লাহ্ সেই সত্তা যিনি স্বীয় সব গুণ ও বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ আর আদিকাল থেকে একই রীতি ও একই নিয়মে তিনি বিদ্যমান। তাঁর মাঝে কোনো পরিবর্তন নেই, তিনি জন্মও নেন না আর মৃত্যুও বরণ করেন না। কোনো জন্মগ্রহণকারী ও মরণশীল অস্তিত্ব তাঁর সাথে তাঁর দাসত্ব করা ছাড়া অন্য এমন কোনো সম্পর্ক রাখে না যাকে তাঁর ঈশ্বরত্বের অংশীদার বলা যায়। বরং এমন ধারণা পোষণ করা সেই সত্তাকে অস্বীকার করার চেয়ে গুরুতর এবং মানুষের সমস্ত কুকর্মের চেয়েও ঘৃণ্যতর একটি ধারণা। এটি সত্য এবং পুরোপুরি সত্য যে, আল্লাহ্ তা'লার গৃহীত বান্দাদের মাঝে নবী বা রসূল নামের মানুষগুলোই সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আর নিঃসন্দেহে তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় ও গৃহীত ব্যক্তি এবং অনেক শ্রদ্ধার প্রাপ্ত। তারা তাঁরই মাঝে বিলীন ও তাঁরই রঙে রঙিন হয়েছেন এবং তাদের মধ্য হতে আল্লাহ্ তা'লার জালাল বা প্রতাপ প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মাঝে খোদা এবং খোদার মাঝে তারা (বিলীন), তথাপি আমরা তাদের কাউকে বাস্তবিক অর্থে খোদা বা খোদার পুত্র বলতে পারি না। এই মতভেদের ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে মুসলমানরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং খ্রিষ্টানরা ভ্রান্তিতে নিপতিত। কিন্তু বর্তমান যুগের খ্রিষ্টানদের মাঝে এ ভ্রান্তিটি বিদ্যমান বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

ইংরেজরা এমন এক জাতি যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিনিয়ত সফলতা, সম্পদ, বিবেকবুদ্ধি ও মেধার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন এবং যারা সততা, সাধুতা ও ন্যায়নিষ্ঠার ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতি করে চলেছে আর তারা যেন অধুনা ও প্রাচীন জ্ঞানের এক ঝরনাস্বরূপ। তাই গভীর প্রত্যাশা হলো আল্লাহ্

তা'লা এ সম্পদও তাদেরকেই দেবেন, বরং আমার মতে হৃদয়গুলোকে ভেতরে ভেতরে দিয়েই দিয়েছেন। যাহোক, আমাদের দৈহিক ব্যবস্থাপনা ও জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লা আমাদের জন্য এ জাতির মধ্যে থেকে সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন আর আমরা এ সরকারের সেসব অনুগ্রহরাজি প্রত্যক্ষ করেছি যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা সহজ কাজ নয়। এজন্য আমরা আমাদের সম্মানিত সরকারকে আশ্বস্ত করছি, আমাদের জ্যেষ্ঠদের মতো আমরাও এ সরকারের প্রতি নিষ্ঠাবান ও হিতাকাঙ্ক্ষী। আমাদের কাছে দোয়া ছাড়া আর কিছু নেই, তাই আমরা দোয়া করছি, এ সরকারকে আল্লাহ তা'লা সব ধরনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন এবং তাদের শত্রুদের লাঞ্ছনার সাথে পরাস্ত করুন। অনুগ্রহশীল সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াকে আল্লাহ তা'লা আমাদের জন্য ঠিক সেভাবেই আবশ্যক করেছেন যেভাবে তাঁর নিজের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াকে আবশ্যক করেছেন। কাজেই এ দয়ালু সরকারের প্রতি আমরা যদি অকৃতজ্ঞ হই অথবা মনের মাঝে কোনো দুরভিসন্ধি রাখি তাহলে আমরা আল্লাহ তা'লার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি নি বলে বিবেচিত হবে। কেননা আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং কোনো দয়ালু সরকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, আল্লাহ তা'লা তাঁর বান্দাদের জন্য নিয়ামতস্বরূপ দান করেছেন এমন দয়ালু কোনো সরকারের অকৃতজ্ঞতা করা— এ দুটি বিষয় আসলে একই সূত্রে গাঁথা এবং একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে ত্যাগ করলে অপরটিও আবশ্যকীয়ভাবে ছুটে যায়। কতিপয় আহম্মক ও নির্বোধ লোক প্রশ্ন করে যে, এ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ (অস্ত্রযুদ্ধ) করা ঠিক কিনা? অতএব স্মরণ রাখা উচিত! এমন প্রশ্ন চরম আহম্মকই করবে। কেননা যার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা একান্ত আবশ্যক এবং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য তার বিরুদ্ধে আবার জিহাদ কীসের? আমি সত্য সত্য বলছি, অনুগ্রহকারীর অমঙ্গল কামনা করা একজন অসৎ ও মন্দ লোকেরই কাজ। সুতরাং আমি বার বার যে বিশ্বাস ব্যক্ত করি তা হলো, ইসলামের দুটি অংশ রয়েছে। একটি হলো, আল্লাহ তা'লার আনুগত্য করা এবং অপরটি হলো, শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী ও অত্যাচারীদের হাত থেকে নিজের ছায়াতলে আশ্রয়দাতা সরকারের আনুগত্য করা। বর্তমানে সেই সরকার হলো, ব্রিটিশ সরকার। যদিও একথা সত্য যে, ইউরোপের জাতিসমূহের সাথে আমাদের ধর্মীয় মতবিরোধ রয়েছে আর আল্লাহ তা'লা সম্পর্কে তারা যে কথা পছন্দ করে তা

আমরা কখনোই পছন্দ করি না। কিন্তু প্রজা ও সরকারের পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে এসব ধর্মীয় বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তা'লা আমাদের সুস্পষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন আর তা হলো, যে সরকারের অধীনে তোমরা শান্তিতে বসবাস করো তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং অনুগত্য করো। কাজেই আমরা যদি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্রোহ প্রদর্শন করি তাহলে তা হবে ইসলাম, আল্লাহ ও রসূল (সা.)-এর প্রতি বিদ্রোহের শামিল।

এমতাবস্থায় আমাদের চেয়ে বড়ো বিশ্বাসঘাতক আর কে হবে? কেননা আমরা আল্লাহ তা'লার আইন ও শরীয়ত ত্যাগ করেছি। অস্বীকার করা যায় না যে, মুসলমানদের মাঝে এমন অনেক লোক আছে যাদের ধর্মীয় বিদ্বেষ তাদের ন্যায়নিষ্ঠা ও ইনসাফের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এমনকি তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে এমন একজন রক্তপিপাসু মাহদীর অপেক্ষায় রয়েছে যে এ পৃথিবীকে বিরোধীদের রক্তে রঞ্জিত করবে। আর এখানেই শেষ নয়, বরং তাদের আরো ধারণা হলো, হযরত ঈসা (আ.)-ও এই উদ্দেশ্য নিয়েই আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। অর্থাৎ মাহদীর হাত থেকে যে-সব ইহুদী ও খ্রিষ্টান বেঁচে যাবে, তিনি যেন তাদের রক্তে পৃথিবীতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেন। সত্য কথা হলো, কিছু মুসলমান যেমন- শেখ মুহাম্মদ হোসাইন বাটালভী ও তার জামা'তের এ ধারণা নিশ্চিতরূপে ভুল ধারণা এবং আল্লাহর কিতাব কুরআন শরীফের পরিপন্থি। এই নির্বোধরা রক্তপিপাসু এবং এদের মাঝে আল্লাহর সৃষ্টি মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা ও হিতাকাঙ্ক্ষা নেই। অথচ আমাদের সত্য ও সঠিক বিশ্বাস, যার জন্য এসব লোক আমাদের কাফের বলে তা হলো মাহদী নামের কেউ আসবে না, অবশ্য মসীহ মওউদ এসে গিয়েছেন, কিন্তু কোনো তরবারি চলবে না। বরং শান্তি, সততা ও ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার একত্ববাদের দিকে মানুষ ফিরে আসবে আর সে সময় আসছে বরং তা সন্নিহিতে যখন এ পৃথিবীতে রামচন্দ্র, কৃষ্ণ এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর পূজা করা হবে না। সত্যিকার পূজারিরা তাদের প্রকৃত প্রভু আল্লাহ তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। স্মরণ রাখা উচিত, যে সরকারের অধীনে আমরা সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করি তার প্রাপ্য অধিকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা আসলে আল্লাহর প্রাপ্য প্রদানের নামান্তর। আর আমরা যদি আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে এমন সরকারের আনুগত্য করি তা হলে তা আমাদের ইবাদতের শামিল। 'আমরা আমাদের হিতৈষীর অনিষ্ট করব, যিনি আমাদের সুশীতল

ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন তার ওপর অগ্নি বর্ষণ করব, যিনি আমাদের খাদ্য দেবেন তাকে পাথর মারব’— এটি কি ইসলামের শিক্ষা হতে পারে? যে ব্যক্তির হৃদয়ে অনুগ্রহকারীর ক্ষতি-সাধনের নিছক ধারণাও জাগে তার চেয়ে বজ্জাত আর কে হতে পারে?

এত সব ভূমিকার মূল উদ্দেশ্য হলো, সরকার যেন মনে রাখে, আমরা তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং সর্বাঙ্গিকভাবে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় লেগে আছি। আমি শুনেছি, গুরুদাসপুর জেলার বাটালা নিবাসী এক ব্যক্তি যে তার পরিচয় মৌলভী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হোসাইন নামে দিয়ে থাকে, এ অধর্মের সাথে কিছু গৌণ বিষয়ে মতবিরোধের কারণে এবং আমার সাথে চরম শত্রুতার দরশন আর সুস্পষ্ট অন্যায় ও বর্বরতার উন্মাদনায় সরকারকে প্ররোচিত করার মানসে সে বাস্তবতা বিবর্জিত কথাবার্তা লিখে থাকে। সরকারের কাছে সে আমার পরিবারের নিষ্ঠা ও হিতাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সম্পর্কের ভুল ব্যাখ্যা দেয় এবং এ সম্পর্কের কথা গোপন করে ও তার মিথ্যাচারের নীচে চাপা দিতে চায়। এছাড়া কেবল শত্রুতা ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সে একথার ওপর জোর দেয় যে, নাউয়িবল্লাহ্ [আমরা আল্লাহ্ তা’লার আশ্রয় প্রার্থনা করি— অনুবাদক] এ অধর্ম সত্যিকার অর্থে সরকারের শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। এ অজ্ঞ লোকটি একটু চিন্তাও করে না যে, সত্যের মাঝে প্রকৃতিগতভাবে যে শক্তি পাওয়া যায় মিথ্যা ষড়যন্ত্র ও ভিত্তিহীন মিথ্যাচারে তা কখনো সৃষ্টি হয় না। সত্যের শক্তির একটি কেরামতই মিথ্যার পাহাড়কে টুকরো টুকরো করে দেয়। এছাড়া মিথ্যার মাঝে হঠকারিতা ও বেইমানীর যে দুর্গন্ধ আছে তা প্রশাসনের খোদাপ্রদত্ত বিচক্ষণতার কাছে গোপনও থাকতে পারে না। যদিও তার সব মিথ্যাচারই এমন মানহানিকর ছিল যে, এর জন্য আদালতের মাধ্যমে তার এ সমস্ত চতুরতার শাস্তি দেওয়া যেত, কিন্তু কার্যত মাননীয় সরকারকে এ ব্যক্তির এসব মিথ্যাচার সম্পর্কে অবগত করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো। এছাড়া আশা করি, বিজ্ঞ সরকার সামান্য মনোযোগ দিলেই তার এসব অপবাদ সম্পর্কে উত্তমরূপে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে এবং যাচাই বাছাই করতে সমর্থ হবে। সত্যিকার অর্থে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো নোংরা প্রকৃতির মানুষ এরূপ অশালীন কাজের দুঃসাহস না দেখায়।

আমাদের বিজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ সরকার এ বিষয়ে অনবহিত নয় যে,

প্রত্যেক সংবাদদাতার জন্য আবশ্যিক হওয়া উচিত, যে বিষয়ে সে সরকারকে নিশ্চিতভাবে অবগত করবে এবং নিজের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত মতামত দেবে ওই বিষয়ে সে যেন পূর্বেই যথাযথভাবে অনুসন্ধান করে নেয়। এখন ন্যায়পরায়ণ এই সরকার চাইলে এমন একটি হিতৈষী পরিবার যাকে তারা তাদের সম্ভ্রষ্টির নিদর্শনস্বরূপ মহান সব সনদে ভূষিত করেছে, তার জন্য এতটুকু কষ্ট স্বীকার করতে পারেন যে, এই মিথ্যাবাদী সংবাদদাতা যে তার 'ইশায়াতুস্ সুন্নাহ' পত্রিকার মাধ্যমে সরকারের কাছে এ অধর্মের বিরুদ্ধে বাস্তবতা বিবর্জিত বিভিন্ন সংবাদ দিয়ে থাকে তাকে ডেকে এর প্রমাণ তলব করতে পারেন যে, সে কোন কোন তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এ অধর্মকে ইংরেজ সরকারের বিদ্রোহী বলে আখ্যা দিয়েছে? আর সে যদি সম্ভ্রাষণজনক তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয় তাহলে তারা যেন যুক্তিযুক্ত গণ্ডির মাঝে থেকে তাকে আইনানুগ শাস্তির কিছুটা স্বাদ গ্রহণ করাতে পারে। কেননা এটি একটি যথাযথ পদক্ষেপ এবং এতে একটি শুভাকাজক্ষী পরিবারের মনস্ত্রুষ্টি হতে পারে বলে আশা যায়। যদিও পাদরি ইমাদুদ্দীন ও অন্যদের মতো কতিপয় ইসলাম বিরোধীর রচনাতেও এমন উন্মাদনা পাওয়া যায়। কিন্তু অজ্ঞতা, ধর্মীয় উন্মাদনা ও দুর্নিবার বিদ্বেষের কারণে তারা কিছুটা অক্ষমও বটে এবং তারা সত্য বলতে জানে না। কিন্তু এই শেখ বাটালভী আসলে সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ন্যায়পরায়ণ সরকার যেন এই ব্যক্তির ১৮৯২ ও ৯৩ইং সনের লেখাগুলোর সাথে সেই লেখাগুলোও মিলিয়ে দেখে যা তার ১৮৮৪ সনের 'ইশায়াতুস্ সুন্নাহ' পত্রিকায় এ অধর্ম সম্পর্কে লেখা আছে, যাতে বুঝা যায় যে, এ ব্যক্তি একজন কপট, সত্য গোপনকারী এবং বহুরূপী। যদিও আমরা জানি, বিচক্ষণ, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার অধিকারী সরকারের সাথে এমন প্রতারণা চলতে পারে না। এছাড়া দূরদর্শী এ সরকার দূর থেকেই বায়ুর গতিপথ বুঝতে পারে এবং বিদ্বেষপূর্ণ গোয়েন্দাগিরিকে অর্থহীন ও লজ্জাকর হিংসা জ্ঞান করে। তথাপি সরকারের ওপর তো কোনো ওহী হয় না আর তার সাথে কিছু দুষ্ট লোকের সুর মেলানোর কারণে সাধারণ মানুষের ন্যায় সরকারও প্রতারিত হতে পারে। কাজেই আমাদের অবস্থান কিছুটা হলেও তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল।

এখন আমরা ১৮৮৪ সালের, অর্থাৎ 'ইশায়াতুস্ সুন্নাহ' পত্রিকার ৭ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা থেকে সেই উদ্ধৃতিটি সরকারের জ্ঞাতার্থে হুবহু উদ্ধৃত করছি যা সে তার উল্লিখিত পত্রিকায় বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের পর্যালোচনায় লিখেছিল।

যাতে করে বিজ্ঞ সরকার নিজেই দেখে নেয় যে, এই ব্যক্তি এ অধম সম্পর্কে পূর্বে কী লিখত আর এখন কী লিখে! আর সেই উদ্ধৃতিটি হলো—

রাজনৈতিক সমালোচনার উত্তর

বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের প্রণেতার অবস্থা ও ধ্যানধারণা সম্পর্কে আমি যতটা অবগত তেমন জানাশোনা লোক আমাদের সমসাময়িক লোকদের মাঝে খুব কমই পাওয়া যাবে। লেখক মহোদয় আমার স্বদেশী, বরং তিনি আমার শৈশবের সহপাঠী (যখন আমরা কুতবী ও শারাহ্ মোল্লাহ্ পড়তাম*)। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার সাথে তাঁর নিয়মিত চিঠিপত্র আদান-প্রদান ও দেখাসাক্ষাৎ অব্যাহত রয়েছে। কাজেই ‘আমি তাঁর চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত’— আমার একথাকে অতু্যক্তি বলা যায় না।

ইংরেজ সরকারের বিরোধিতার চিন্তা লেখক মহোদয়ের মাথায় কখনোই আসে নি। তিনি তো দূরের কথা, তাঁর পরিবারেও এমন মানসিকতার কেউ নেই। বরং তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেব চরম বিশৃঙ্খলা (১৮৫৭ সালের সিপাহি)-এর যুগে ইংরেজ সরকারের হিতাকাজক্ষী, নিবেদিতপ্রাণ এবং বিশ্বস্ত হবার বিষয়টি কার্যত প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এই বিদ্রোহের যুগে গুরুদাসপুর সংলগ্ন ত্রিমুর ঘাটে দুষ্কৃতকারী বিদ্রোহীরা যখন আক্রমণ করেছিল তখন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা অনেক বড়ো জায়গিরদার ও নেতা না হওয়া সত্ত্বেও সরকারের সাহায্যার্থে নিজ খরচে অশ্বারোহী ও প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামসহ তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র মরহুম মির্যা গোলাম কাদেরের নেতৃত্বে ৫০টি ঘোড়া দিয়েছেন। ফলে এ সেবার দরুন সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং তিনি কিছুটা পুরস্কারও পেয়েছেন। এ ধরনের সেবা ছাড়াও মরহুম মির্যা সাহেব (লেখক মহোদয়ের পিতা) সর্বদাই সরকারের যথেষ্ট প্রিয়ভাজন ছিলেন এবং গভর্নরের কার্যালয়ে তাঁকে বসার জন্য সম্মানের সাথে আসন দেওয়া হতো। এছাড়া জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা (অর্থাৎ ডেপুটি কমিশনার ও কমিশনার সাহেব) বিভিন্ন সময় তাঁকে (সম্ভ্রষ্ট জ্ঞাপক চিঠিপত্র) দিতেন, যেগুলোর কয়েকটি চিঠি এখনো

* টীকা: আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বাল্যশিক্ষা ও আদর্শ লিপি পড়ার যুগ— অনুবাদক।

আমাদের কাছে আছে। এসব চিঠি থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এগুলো অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে লেখা হয়েছে, যা একজন বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী ও সত্যিকার বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য লেখা হয় না। ডেপুটি কমিশনার ও কমিশনার সাহেব তাদের অধিকাংশ পরিদর্শনের সময় ভদ্রতা, ভালোবাসা ও মনস্তৃষ্টির জন্য মির্যা সাহেবের বাড়ি গিয়ে সাক্ষাৎ করতেন। এছাড়া তাঁর মৃত্যুতে কমিশনার সাহেব, ফিন্যান্সিয়াল কমিশনার সাহেব এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর বাহাদুর তাদের পত্রে গভীর শোক প্রকাশ করেন আর ভবিষ্যতে (তাদের সেবার) মূল্যায়ন এবং এ পরিবারের (মর্যাদার) প্রতি সুদৃষ্টি রাখার ও অনুগ্রহ করার প্রতিশ্রুতি দেন। ভদ্র ও পুরোনো হিতাকাঙ্ক্ষী পরিবার হবার জন্য মির্যা সুলতান আহমদ (লেখকের পুত্র)-এর অনুকূলে তহশিলদার পদে চাকরির জন্য ফিন্যান্সিয়াল কমিশনার সাহেব সম্প্রতি বিশেষভাবে সুপারিশ করেছেন, যা বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত জেলাপ্রশাসকের প্রতিবেদনটি ইতোমধ্যে প্রেরণের পর পথে রয়েছে। মোটকথা, এ পরিবারটি পূর্ব থেকেই হিতাকাঙ্ক্ষী ও সরকারের সুদৃষ্টিভাজন হয়ে এসেছে। এসব কথা ও ঘটনার সত্যায়নের জন্য সবগুলো পত্র থেকে যেগুলো দৃষ্টিপটে রয়েছে তা থেকে কেবল তিনটি পত্র আমি টীকায় উদ্ধৃত করছি যেন অপরিণামদর্শী হিংসুক লোকেরা ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিতে এই পরিবারের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়ে মন্দ অভিপ্রায় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা থেকে বিরত হয় আর সাধারণ মুসলমানরা যেন তাদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে এই পুস্তক ও এর প্রণেতার প্রতি কুধারণা পোষণ না করে আর ভীত না হয়।

জে. নিকলসন সাহেবের সনদের অনুবাদ নম্বর: ৩৫৩ প্রতি মির্যা গোলাম মুর্তজা খান, রইস, কাদিয়ান। আমি আপনার আবেদতি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়েছি।	Translation of certificate of J. Nicholson. To Mirza Ghulam Murtaza Khan, Chief of Qadian I have perused your application reminding me
---	---

এতে আপনি আপনার এবং আপনার পরিবারের অতীতের সাহায্য-সহযোগিতা ও ন্যায্য অধিকারের কথা স্মরণ করিয়েছেন। আমি খুব ভালোভাবেই অবগত আছি যে, ব্রিটিশ সরকারের সূচনালগ্ন থেকেই আপনি ও আপনার পরিবার (এ সরকারের প্রতি) অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ, বিশ্বস্ত ও অবিচল ছিলেন আর আপনাদের অধিকারসমূহ আসলেই সব দিক থেকে বিবেচনার দাবি রাখে।

আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, ব্রিটিশ সরকার আপনার ও আপনার পরিবারের ন্যায্য অধিকার এবং আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথা কখনোই ভুলবে না এবং আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, অনুকূল পরিবেশ পেলেই (সরকার) আপনাদের এই সেবার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করবে।

আপনারা অবশ্যই বরাবরের মতো বিশ্বস্ত ও নিবেদিতপ্রাণ প্রজা হিসেবেই থাকবেন, কেননা এর মাঝেই সরকারের সমৃদ্ধি এবং আপনাদের মঙ্গল নিহিত।

১১ জুন ১৮৪৯ইং
আনারকলি, লাহোর।

of your and your family's past services and rights. I am well aware that since the introduction of the British Govt. you and your family have certainly remained devoted, faithful and steady subjects and that your rights are really worthy of regard. In every respect you may rest assured and satisfied that the British Govt. will never forget your family's rights and services which will receive due consideration when a favourable opportunity offers itself.

You must continue to be faithful and devoted subjects as in it lies the satisfaction of Govt. and your welfare.

11.6.1849

যদিও বিশেষ করে পুস্তক প্রণেতা (মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব)-এর আলেমানা ও দরবেশানা বেশভূষার দরুন তাঁর সাথে এমন কোনো বিশেষ আচরণ করা হয় নি।

রবার্ট কাস্টের সনদের অনুবাদ প্রতি, মির্যা গোলাম মুর্তজা খান, রইস, কাদিয়ান। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের সময় আপনি যেহেতু অশ্বারোহীদের তালিকা প্রণয়ন ও ঘোড়া সরবরাহের মাধ্যমে সরকারকে অনেক বড়ো সাহায্য করেছেন এবং বিদ্রোহের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্য প্রদর্শন করে আসছেন। আর এভাবে আপনি সরকারের সম্ভৃষ্টি অর্জন করেছেন। সেহেতু আপনার উত্তম সাহায্য-সহযোগিতার স্বীকৃতিস্বরূপ এবং আপনার আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ আপনাকে ২০০ রুপি মূল্যের একটি ‘খিলাত’ (রাজকীয় পোশাক) উপহার দেওয়া হলো। এছাড়াও আপনার বিশ্বস্ততা ও সুখ্যাতির জন্য আপনার প্রতি সরকারের সম্ভৃষ্টির স্মারক হিসেবে চীফ কমিশনার সাহেবের ইচ্ছায় ১০ আগস্ট ১৮৫৮ সালের ৫৭৬ নম্বর পত্র মারফত আপনাকে এই পরওয়ানাটি প্রেরণ করা হলো। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ইং	Translation of Mr. Robert Cast's certificate. To Mirza Ghulam Murtaza Khan, Chief of Qadian. As you rendered great help in enlisting sowars & supplying horses to Govt. in the mutiny of 1857 and maintained loyalty since its beginning up to date and thereby gained the favor of Govt. a khilat worth Rs 200/- is presented to you in recognition of Good services and as a reward for your loyalty. Moreover in accordance with the wishes of Chief Commissioner as conveyed in his No. 576, dt. 10th August 1858, this Parwana is addressed to you as a token of satisfaction of Govt. for your fidelity and repute.
--	--

কিন্তু একজন আলেম ও দরবেশ হিসেবে সম্মানিত সরকারের যতটা হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া সংগত এবং যতটা তাঁর সাধের মধ্যে ছিল তা পালনে তিনি কার্পণ্য করেন নি। জ্ঞানীদের তরবারি কলম আর সন্ন্যাসীর অস্ত্র দোয়া। এসব অস্ত্র দ্বারা সরকারের শুভকামনা ও সহায়তা করার ক্ষেত্রে পুস্তক প্রণেতা কোনোই কার্পণ্য করেন নি।

ফিন্যান্সিয়াল কমিশনার স্যার রবার্ট ইগারটনের সনদের অনুবাদ প্রিয় বন্ধু গোলাম কাদের, চলতি মাসের ২ তারিখে আপনার লেখা পত্রটি আমি তাৎক্ষণিকভাবে মনোযোগের সাথে পড়েছি। আপনার পিতা গোলাম মুর্তজা সাহেবের মৃত্যুতে আমি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি, তিনি সরকারের একজন মহান হিতাকাঙ্ক্ষী ও বিশ্বস্ত রইস ছিলেন। আপনাদের পরিবারের সেবা ও সহযোগিতা বিবেচনাপূর্বক এখন থেকে আমি আপনাকেও সেই মর্যাদাই প্রদান করব যা আপনার বিশ্বস্ত পিতাকে প্রদান করা হতো। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলেই আমি আপনার পরিবারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ সাধনের বিষয়টি মনে রাখব। ২৯ জুন ১৮৭৬ইং	Translation of Sir Robert Egerton Financial Commr's: Murasala dt. 29th June 1876 My dear friend Ghulam Qadir, I have perused your letter of the 2nd instant and deeply regret the death of your father Mirza Ghulam Murtaza who was a great well wisher and faithful Chief of Govt. In consideration of your family services I will esteem you with the same respect as that bestowed on your loyal father. I will keep in mind the restoration and welfare of your family when a favourable opportunity occurs. 29th June 1876.
--	--

তিনি তাঁর কলম দিয়ে বার বার লিখেছেন এবং যে পুস্তকের প্রচার করা তাঁর জন্য নিত্যদিনের কর্তব্য সেই পুস্তকেই তিনি সুস্পষ্টরূপে লিখেছেন,* ‘ইংরেজ সরকার আল্লাহ্ তা’লার ঐশ্বরিক পুরস্কারগুলোর একটি। এটি মহান আশির্বাদ, এ সরকার মুসলমানদের জন্য ঐশী কল্যাণধারার মর্যাদা রাখে।

দয়ালু খোদা মুসলমানদের জন্য এ সরকারকে কৃপাবারিরূপে প্রেরণ করেছেন। এমন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ‘মুসলিম জাতি যে সরকারের অধীনে বসবাস করে তার অনুগ্রহভাজন হয়, তার তত্ত্বাবধানে শান্তিতে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করে নিজেদের জীবন উপভোগ করে এবং তার নিরবচ্ছিন্ন বদান্যতায় লালিত পালিত হয় আবার বিচ্ছুর ন্যায় তাকেই দংশন করবে’- এটি কখনোই ইসলামী নীতি নয়। তিনি তাঁর

* টীকা: এ পুস্তকের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড হতে সংক্ষেপে লেখকের মূল বক্তব্য তুলে ধরা হলো। তৃতীয় খণ্ডের প্রারম্ভিক পৃষ্ঠাসমূহে তিনি লিখেছেন, নিজেদের অবস্থার সংশোধনের জন্য সংকল্প ও চেষ্টার মাধ্যমে মুসলমানদের যে-সব কর্ম সম্পাদন করা আবশ্যিক সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এসব বিষয়ের মধ্যে থেকে এ বিষয়টি এখানে উল্লেখযোগ্য যার ওপর নির্ভর করে ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহ ও কৃপাদৃষ্টি। অর্থাৎ প্রশংসাজনক সরকারের হৃদয়ে খুব ভালোভাবে এ বিষয়টি গেঁথে দেওয়া উচিত যে, ভারতবর্ষের মুসলমানরা বিশ্বস্ত প্রজা। কেননা কতিপয় অজ্ঞ ইংরেজ, বিশেষ করে শিক্ষা কমিশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডাক্তার হান্টার সাহেব তার একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে অত্যন্ত জোরালো দাবির সাথে লিখেছেন, মুসলমানরা ইংরেজ সরকারের আন্তরিকভাবে শুভাকাঙ্ক্ষী নয় এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে তারা ফরয তথা বাধ্যতামূলক জ্ঞান করে। যদিও ইসলামী শরীয়তের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রত্যেকের কাছে ডাক্তার সাহেবের এ ধারণা নিতান্তই অমূলক ও অবাস্তব বলে প্রমাণিত হবে। তথাপি পরিতাপের বিষয় হলো, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী কিছু সংখ্যক মানুষ ও কতক অসভ্য নির্বোধ লোকের হীন কার্যকলাপ এমন ধারণার সমর্থন করেছে। এসব কাকতালীয় অভিজ্ঞতার ফলেই হয়ত উল্লিখিত ডাক্তার সাহেবের সন্দেহ দৃঢ়তা লাভ করেছে। কেননা অজ্ঞ লোকদের পক্ষ থেকে কখনো কখনো এ ধরনের কার্যক্রম দৃশ্যপটে এসে থাকে, কিন্তু একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এ বিষয়টি গোপন থাকতে পারে না যে, এমন লোকেরা ইসলামী রীতিনীতি থেকে যোজন যোজন দূরে আর তারা তেমনই মুসলমান যেভাবে ম্যাকলাইন খ্রিষ্টান ছিল।

দোয়াতেও অনেক বার এই সরকারকে স্মরণ করেছেন। তাঁর শেষ দোয়াটি অমৃতসরের রিয়াযে হিন্দ ছাপাখানায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে রয়েছে, যার বিশ

* **চলমান টীকা:** অতএব এটি সুস্পষ্ট যে, তারা শরীয়তের কারণে এমনটি করে না, বরং এটি তো তাদের ব্যক্তিগত কুকীর্তি। এদের বিপরীতে সেই হাজার হাজার মুসলমানকে দেখা উচিত, যারা সর্বদাই ইংরেজ সরকারের মঙ্গল কামনা করে আসছে এবং করে। ১৮৫৭ইং সালে যে বিদ্রোহ হয়েছিল তাতে অজ্ঞ ও দুষ্ণ লোক ব্যতীত জ্ঞানী-গুণী, সভ্য ও পুণ্যবান কোনো মুসলমান কখনোই যুক্ত হয় নি। বরং পাঞ্জাবের হতদরিদ্র মুসলমানরাও ইংরেজ সরকারকে সাধ্যাতীত সাহায্য করেছে। যেমন- আমার শ্রদ্ধেয় মরহুম পিতা অপ্রতুল সামর্থ্য সত্ত্বেও তার নিষ্ঠা ও হিতাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে দক্ষ ও যোগ্য ৫০জন সৈনিকসহ নিজের গাঁট থেকে ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে সরকারকে সাহায্যস্বরূপ উপহার দেন আর সামর্থ্যের বাইরে সহমর্মিতা প্রদর্শন করেন। এছাড়া যে-সব মুসলমান বিভবান ও সামর্থ্যবান ছিলেন তারা তো অনেক বড়ো বড়ো ও উল্লেখযোগ্য সেবা করেছেন। এখন আমরা পুনরায় এ বক্তৃতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি। যদিও মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার অনেক বড়ো বড়ো দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়েছে, তথাপি মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, ডাক্তার সাহেব মুসলমানদের সেই সমস্ত বিশ্বস্ততাকে উপেক্ষা করেছেন এবং ফলাফল বের করতে গিয়ে সেসব নিষ্ঠাপূর্ণ সেবাকে তার সূক্ষ্ম বা স্থূল চিন্তার কোনো অংশেই স্থান দেন নি। যাহোক, এমনসব লোকের প্রতারণায় সরকার প্রতারিত হবার পূর্বেই নিজেদের হিতাকাঙ্ক্ষিতার বিষয়টি ফলাও করে প্রকাশ করা আমাদের মুসলমান ভাইদের জন্য একান্ত আবশ্যিক। যে সরকারের অধীনে মুসলমানরা শান্তিপূর্ণভাবে, নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে, যাদের দানদক্ষিণা এবং দয়া ও অনুগ্রহের কাছে মানুষ ঋণী এবং যাদের আশিসময় রাজত্ব প্রকৃতপক্ষে পুণ্য ও হিদায়াত বিস্তারের ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে সহায়ক, সেই সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করা নিশ্চিতরূপে হারাম। তাই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, ইসলামের আলেমরা একমত হয়ে এ বিষয়টি উত্তমরূপে প্রকাশ না করে অজ্ঞ লোকদের কথা ও লেখায় আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে, যেগুলোর মাধ্যমে তাদের ধর্মের দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং বিনাকারণে তাদের জাগতিক স্বার্থেরও হানি ঘটে।

অতএব এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এ অধর্মের অভিমত হলো, এ কাজের জন্য লাহোর, কোলকাতা, মুম্বাই প্রভৃতি স্থানের আঞ্জুমানে ইসলামীয়া যেন প্রখ্যাত এমন কয়েকজন মৌলভী সাহেবকে মনোনীত করে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব, জ্ঞান, ধার্মিকতা ও তাকওয়া অধিকাংশ মানুষের কাছে স্বীকৃত, অর্থাৎ নিজেদের আশপাশের অঞ্চলে যাদের কিছুটা খ্যাতি রয়েছে আর উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে এ কাজের জন্য মনোনীত এসব আলেমকে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্র মারফত জানিয়ে দেয় যে, তারা যেন এই মর্মে জ্ঞানগর্ভ

হাজার কপি ছাপিয়ে তিনি ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডে প্রচার করতে চেয়েছেন তাতে দোয়ার সেই বাক্যগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে।

* **চলমান টীকা:** প্রবন্ধ রচনা করে পাঠায় যাতে শরীয়তের শিক্ষানুসারে মুসলমানদের অভিভাবক ও অনুগ্রহপরায়ণ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদের পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকবে। (প্রবন্ধ-সংবলিত) সবগুলো চিঠি জমা হবার পর সেগুলোকে যেন কোনো একটি উন্নত মানের ছাপাখানা থেকে ছাপা হয়, যার নাম হতে পারে ‘মকতুবাতে ওলামায়ে হিন্দ তথা ভারতবর্ষের আলেমদের প্রত্নাবলি’। আর এরপর এর ১০-২০টি কপি সরকারের কাছে পাঠিয়ে অবশিষ্ট কপিগুলো ভারতবর্ষ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোতে যেন বিতরণ করা হয়। একথা সত্য যে, কয়েকজন দরদী মুসলমান ডাক্তার হান্টার সাহেবের মতবাদ খণ্ডন করে উত্তর লিখেছেন। কিন্তু এই দু-চারজনের যুক্তিখণ্ডন সর্বসাধারণের খণ্ডনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। গণহারে খণ্ডনের প্রভাব নিঃসন্দেহে এত বেশি শক্তিশালী ও দৃঢ় হবে যে, এর ফলে ডাক্তার সাহেবের ভ্রান্ত সব লেখা ধুলায় মিশে যাবে এবং কিছু সংখ্যক অজ্ঞ মুসলমানও তাদের সত্য ও পবিত্র নীতি সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে অবগত হবে। ইংরেজ সরকারের কাছেও মুসলমান প্রজাদের হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও হিতাকাঙ্ক্ষা যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়ে যাবে। এছাড়া পাহাড়ি কিছু অজ্ঞ লোকের ধ্যানধারণার সংশোধনও এ পুস্তকের উপদেশ ও নসিহতের মাধ্যমে হতে থাকবে।

অবশেষে নিজের জন্য আমি একথাটি বলাও একান্ত আবশ্যিক মনে করছি যে, ইংরেজ সরকার তার শাস্তিপ্রদ প্রশাসনের মাধ্যমে জনসাধারণের প্রতি যে-সব অনুগ্রহ করেছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে যদিও পুরো ভারতবর্ষেরই উচিত, এ প্রশংসিত সরকারকে আল্লাহ তা’লার এক নেয়ামত জ্ঞান করা এবং ঐশী এ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কিন্তু পাঞ্জাবের মুসলমানরা যদি তাদের জন্য এ সরকারকে আল্লাহ তা’লার পক্ষ থেকে এক মহান অনুগ্রহ ও নেয়ামত মনে না করে তাহলে তারা চরম অকৃতজ্ঞ বলে বিবেচিত হবে। তাদের ভাবা উচিত, এ সরকারের পূর্বে তারা কেমন দুঃখকষ্টে জর্জরিত ছিল আর পরে কেমন শান্তি ও নিরাপত্তার বলয়ে চলে এসেছে! অতএব এ সরকার তাদের জন্য আসলে এক ঐশী আশিসের মর্যাদা রাখে, যাদের আগমনে তাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট দূর হয়েছে এবং সব ধরনের অন্যায়-অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন থেকে তারা মুক্তি লাভ করেছে আর সকল প্রকার অন্যায়, বাধাবিলম্ব ও প্রতিবন্ধকতা থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে। এখন এমন কোনো প্রতিবন্ধক নেই যা আমাদের পুণ্যকর্ম করার পথে বাদ সাধবে অথবা আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যে বিঘ্ন ঘটাবে। কাজেই সত্যিকার অর্থে পরম করুণাময় ও দয়ালু খোদা মুসলমানদের জন্য এ সরকারকে এক রহমতের বারিধারা হিসেবে প্রেরণ

ইংরেজদের ভদ্র, সভ্য ও দয়ালু সরকার স্বীয় অনুগ্রহ ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে আমাদের বাধিত করে আমাদের হৃদয়ে এ বিষয়ে আন্তরিক উদ্দীপনা

* চলমান ঢাকা: করেছেন, যার মাধ্যমে ইসলাম নামের চারাগাছটি এই পাঞ্জাবে আবার সবুজ-শ্যামল হয়ে বেড়ে উঠছে। তাদের উপকারসমূহ স্বীকার করা আসলে আল্লাহর অনুগ্রহরাজিরই স্বীকৃতি দেওয়া। এ সরকার-প্রদত্ত স্বাধীনতা এমন স্বীকৃত সত্য যে, অন্যান্য দেশ থেকেও নিপীড়িত, নির্যাতিত মুসলমানরা হিজরত করে এ দেশে চলে আসাকে মনেপ্রাণে পছন্দ করে।

আমার মতে মুসলমানদের সংশোধন এবং তাদের (রীতিনীতির) সাথে নিবিড়ভাবে মিশে যাওয়া বিদাত দূর করার জন্য এ সরকারের ছত্রছায়ায় যতটা নির্বিঘ্নে ওয়াজ-নসিহত করা যায়, এছাড়া যে-সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য এ সরকারের অধীনে মুসলমান আলেমদের মাঝে উদ্যম ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয় এবং চিন্তাভাবনাকে যতটা উত্তমরূপে কাজে লাগানো যায় আর গভীর গবেষণার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সমর্থনে বিভিন্ন পুস্তক সংকলিত হয়ে ইসলাম বিরোধীদের সামনে যেভাবে ইসলামের সত্যতার অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব তা এখন আর অন্য কোনো দেশে সেভাবে সম্ভব নয়। এই সেই সরকার যার ন্যায়নিষ্ঠ সমর্থনে অনেক দিন পর, মনে হয় প্রায় কয়েক শত বছর পর আলেম সম্প্রদায় নির্দিধায় বিদাতের নোংরামি, শিরকের অনিষ্ট, সৃষ্টি পূজার নৈরাজ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকদের অবগত করার এবং নিজেদের প্রিয় নবী (সা.)-এর বক্তৃতামুক্ত পথকে সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছে। এমন সরকারের অমঙ্গল কামনা করা কি বৈধ হতে পারে যার অধীনে সকল মুসলমান সুখশান্তিতে ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে, ধর্মের আবশ্যিক কর্মগুলো যথাযথভাবে পালন করে এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগী? না, কখনোই এটি বৈধ নয় আর কোনো পুণ্যবান ও ধর্মপরায়ণ মানুষ মনের মাঝে এমন কুচিন্তার স্থানই দিতে পারে না। আমি সত্য সত্য বলছি, এখন পৃথিবীতে শুধু একটি দেশই আছে যার অনুগ্রহের ছায়ায় কতক ইসলামী উদ্দেশ্য এমনভাবে বাস্তবায়ন করা যায় যা অন্য কোনো দেশে কখনোই সম্ভব নয়। শিয়াদের দেশে গেলে সেখানে তারা সুন্নিদের বক্তৃতায় ক্ষুব্ধ হয় আর সুন্নিদের দেশে শিয়ারা তাদের মত প্রকাশে ভয় পায়। একইভাবে মুকাল্লিদরা মুওয়াহেদ এবং মুওয়াহেদরা মুকাল্লিদদের শহরে টু শব্দটিও করতে পারে না আর কোনো বিদাত স্বচক্ষে দেখার পরও যেন তা বলার কোনো উপায় নেই। সত্য কথা হলো, এই একটি দেশই আছে যাদের আশ্রয়ে প্রতিটি ফিরকা তাদের নিজ নিজ মতামত নির্বিঘ্নে ও স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশ করে আর এ বিষয়টি সত্যানুসারীদের জন্য খুবই উপকারী। কেননা যে দেশে কথা বলার সুযোগই নেই এবং উপদেশ দেবার সাহসই করা যায় না সে দেশে

সৃষ্টি করেছে যে, আমরা যেন নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে তাদের ধর্মীয় এবং জাগতিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা কামনা করি যাতে

* **চলমান টীকা:** পুণ্যের প্রসার কীভাবে সম্ভব? পুণ্যবানরা যে দেশে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে সে দেশই সত্যের প্রসার লাভের জন্য যথার্থ স্থান। এ বিষয়টিও বুঝা উচিত যে, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা এবং নিপীড়ন দূর করাই ধর্মীয় জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সেসব দেশের বিরুদ্ধেই ধর্মীয় জিহাদ হয়েছিল যেখানে বক্তারা বক্তৃতা করার সময় প্রাণনাশের আশঙ্কা করত এবং যেখানে নিরাপদে বক্তৃতা করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। আর কোনো ব্যক্তি সঠিক পথ অবলম্বন করে স্বজাতির নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে নিরাপদ থাকতে পারত না। কিন্তু ইংরেজ সরকারের স্বাধীনতা শুধু এসব কদাচার থেকেই মুক্ত নয়, বরং ইসলামের উন্নতির ক্ষেত্রে পরম সাহায্যকারী ও সহায়কও বটে। কাজেই মুসলমানদের উচিত, আল্লাহ্-প্রদত্ত এই নেয়ামতের মূল্যায়ন করা এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ধর্মীয় উন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া।

আর চতুর্থ খণ্ডের প্রাথমিক পৃষ্ঠাগুলোতে তিনি লেখেন, অল্প কিছুকাল হয় তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত ইংরেজ সরকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক প্রবন্ধ সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্য থেকে কোনো কোনো মহোদয় আপত্তি উত্থাপন করেছেন। কেউ চিঠি লিখেছে আর কেউবা আবার কঠোর ও রুক্ষ ভাষায় লিখেছে, ইংরেজ সরকারকে কেন অন্যান্য সরকারের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি? কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, নিজেদের সভ্যতা-ভব্যতা ও সঠিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে যে সরকার প্রাধান্যপ্রাপ্ত তাকে আমরা কীভাবে গোপন করব? স্বীয় অবস্থার নিরিখে গুণাবলি তো গুণাবলিই তা যে সরকারের মাঝেই পাওয়া যাক না কেন। **الْجُكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ** [অর্থাৎ প্রজ্ঞা মু'মিনের হারানো ধন। -অনুবাদক] আর এ-ও বুঝা উচিত যে, 'মুসলিম জাতি যে সরকারের অধীনে থেকে তাদের অনুগ্রহভাজন হবে তাদের সহায়তার ছায়া তলে সুখশান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করবে, তাদের বরাদ্দকৃত রিয়ক ভোগ করবে, তাদের ধারাবাহিক পুরস্কারে প্রতিপালিত হবে আর পরে তাকেই বিচছুর মতো দংশন করবে এবং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষা ও মানবতার জন্য বিন্দুমাত্রও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না'— এটি আদৌ ইসলামের কোনো নীতি নয়। বরং আমাদের পরম করুণাময় খোদা তো তাঁর প্রিয় রসূল (সা.)-এর মাধ্যমে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, আমরা যেন উত্তম ব্যবহারের বিনিময়ে অতি উত্তম ব্যবহার করি এবং অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হই আর সুযোগ পেলেই যেন আমরা এমন সরকারের সাথে আন্তরিক নিষ্ঠা ও পরম সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করি এবং সানন্দে ন্যায়সংগত ও আবশ্যিক আনুগত্য করি। অতএব তৃতীয় খণ্ডের সাথে সংযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট অংশে এ অধম ইংরেজ সরকারের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে তা শুধু নিজের ব্যক্তিগত ধারণার

তাদের গৌর ও শুভ্র মুখগুলো ইহজগতে যেমন সুন্দর, পরকালেও তেমনই জ্যোতির্ময় ও আলোকিত থাকে।

فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى خَيْرَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔
اللَّهُمَّ اهْدِهِمْ وَأَيِّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْكَ وَاجْعَلْ لَهُمْ حَقًّا كَثِيرًا فِي دِينِكَ

[অর্থ: অতএব আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমরা তাদের জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করি। হে আমার আল্লাহ্! তাদেরকে তুমি হিদায়াত দাও, তোমার রুহুল কুদুস দ্বারা তাদের সাহায্য করো এবং তাদেরকে তুমি তোমার ধর্মের বৃহৎ একটি অংশ বানাও।- অনুবাদক।]

অতএব এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে এ অপবাদ দেওয়া যে, তার হৃদয়ে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা রয়েছে এবং তাঁর পুস্তককে সরকার বিরোধী ধারণা করা চরম পর্যায়ের ঈমানহীনতা ও শয়তানী দুষ্কৃতি ছাড়া আর কী হতে পারে? সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী ও ইসলাম ধর্মের অনুসারী সম্পর্কে অপলাপকারী হিংসকের কথা কখনোই শোনা উচিত নয় এবং এ পুস্তক বা এর রচয়িতা সম্পর্কে নিজেদের অন্তরে কুধারণা পোষণ করাও উচিত নয়। আমরা তো পূর্ব থেকেই সরকারের প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা আমরা বিশ্বাস করি, পুস্তক প্রণেতা সম্পর্কে এসব কথায় তারা কখনোই কর্ণপাত করবে না। বরং সরকারকে যারা এসব কথা বলবে তাদেরকে তারা তাদের মিথ্যাচারের জন্য ভর্ৎসনা করবে।

* চলমান টীকা: বশবর্তী হয়ে করে নি। বরং এ অধর্মের দৃষ্টিতে থাকা পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর হাদীসের জোরালো তাগিদ আমাকে এ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে বাধ্য করেছে। অতএব এটি হলো আমাদের কিছু নির্বোধ ভাইয়ের বাড়াবাড়ি, যাকে তারা নিজেদের অদূরদর্শিতা ও সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে ইসলামের অংশ মনে করে নিয়েছে।

اے بغاکیش نہ عذرت طریق عشاق ہرزہ بدنام کئی چند نکو نای را

হে নিষ্ঠুর! অজুহাত দেখানো প্রেমিকের কাজ নয়,
তুমি তো অযথাই কতিপয় সুখ্যাত (প্রেমিক) মানুষের দুর্নাম করছো।

(বারাহীনে আহমদীয়া)

মুদ্রণ: পাঞ্জাব প্রেস, শিয়ালকোট।

২৭ ডিসেম্বর ১৮৯৩ইং সনের জলসা মূলতুবি

আমি বড়োই পরিতাপের সাথে লিখছি, আমরা এমন কিছু বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছি যা আমাদের মতামতকে এবারের জলসা মূলতুবি রাখার অনুকূলে পরিচালিত করেছে। কিছু মানুষ যেহেতু অবাক হয়ে ভাববে, এ মূলতুবির কারণ কী? তাই সংক্ষেপে এসব কারণের কিছুটা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রথম কারণ: এ জলসার উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য ছিল, আমাদের জামা'তের লোকেরা কোনোভাবে যেন পুনঃপুন সাক্ষাতের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে এমন এক পরিবর্তন সাধন করে যার কল্যাণে তাদের হৃদয় পুরোপুরি পরকালের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তাদের মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে আর তারা ধার্মিকতা, তাকওয়া, খোদাভীতি, সংযম, নম্রতা, পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে অন্যদের জন্য আদর্শ স্থানীয় হবে। এছাড়া তাদের মাঝে বিনয়, নম্রতা ও সততার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে এবং ধর্মীয় গুরুদায়িত্ব পালনে তারা সক্রিয় হবে। কিন্তু গত বছরের জলসার পর এমন কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নি, বরং বিশেষ করে জলসার এই দিনগুলোতেই কারো কারো বিরুদ্ধে এ অভিযোগ কানে এসেছে যে, কোনো কোনো ভাইয়ের মন্দ আচরণে তারা অসন্তুষ্ট এবং বিশাল এই সমাবেশে নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য অন্যের সাথে কেউ কেউ দুর্ব্যবহার করেছে। মনে হয় যেন এ সমাবেশই তাদের জন্য পরীক্ষা ডেকে এনেছে। এছাড়াও আমি লক্ষ করছি, জলসার পর থেকে এখন পর্যন্ত এ জামা'তের কিছু কিছু লোকের মাঝে খুব একটা ভালো ও নেক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না আর এমন অভিজ্ঞতার জন্যই এ প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে, কেননা সেই দিনগুলো থেকে আজ পর্যন্ত অতিথিদের বেশ বড়ো একটি সংখ্যা এই অধর্মের কাছে পর্যায়ক্রমে অবস্থান করছে, অর্থাৎ কতক আসে আর কতক চলে যায়। কখনো কখনো অতিথিদের এই সংখ্যা শতকের কোটাতেও পৌঁছেছে আবার কখনো এর কম। কিন্তু কখনো কখনো এই সমাবেশে অপ্রতুল আবাসন ব্যবস্থা এবং আতিথেয়তার উপকরণের স্বল্পতার দরুন কোনো কোনো অতিথিকে পরস্পরের সাথে এমন নিম্নমানের অসন্তোষ ও স্বার্থপরতাপূর্ণ কঠোর সমালোচনা করতে দেখেছি, যেভাবে রেলগাড়ির যাত্রীরা আসন স্বল্পতার জন্য পরস্পরের সাথে ঝগড়া করে এবং কোনো অসহায় ব্যক্তি ট্রেন ছাড়ার ঠিক পূর্ব

মুহূর্তে তার পোটলা-পুটলি নিয়ে দিশেহারা হয়ে দৌড়ে তাদের কাছে এলে তারা তাকে ধাক্কা মেরে তড়িয়ে দেয় আর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলে, আমাদের এখানে জায়গা নেই। অথচ স্থান সংকুলান সম্ভব কিন্তু তারা পাষণ্ড হৃদয়ের পরিচয় দেয়। আর সে টিকিট ও গাঁটরি-বাঁচকা নিয়ে এদিক-সেদিক ছুটতে থাকে তথাপি তার প্রতি কেউ দয়া করে না। কিন্তু অবশেষে রেলের কর্মী জোরপূর্বক তাকে জায়গা করে দেয়। কাজেই এ সমাবেশও একইভাবে নৈতিক কিছু অবক্ষয়ের একটি কারণ বলে মনে হচ্ছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আতিথেয়তার সমুদয় উপকরণের ব্যবস্থা না হবে এবং আমাদের জামা'তের মাঝে আল্লাহ তা'লা তাঁর বিশেষ কৃপায় বিনয়, নম্রতা, সহানুভূতি, সেবা ও সহনশীলতার কিছুটা উপাদান সৃষ্টি না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত এ জলসা যৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে না। অথচ মন তো চায়, যারা বয়আত করেছে তারা যেন শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সফর করে আসে আর আমার সাহচর্যে থাকে এবং নিজেদের মাঝে কিছুটা পরিবর্তন সাধন করে ফিরে যায়, কেননা মৃত্যুর কোনো বিশ্বাস নেই। বয়আতকারীদের জন্য আমার সাক্ষাৎ কল্যাণকর। কিন্তু কেবল সে-ই আমাকে দেখে যে অবিচলতার সাথে ধর্ম অন্বেষণ করে এবং শুধুমাত্র ধর্মই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

অতএব এমন সদিচ্ছার অধিকারী মানুষের আগমন সর্বদাই উত্তম, কোনো জলসার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং অন্য সময় তারা ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে কথা বলতে পারে। পার্থিব মেলার মতো অনর্থক এর ব্যবস্থা করা আবশ্যিক নয়, বরং এর আয়োজন সদিচ্ছা ও উত্তম ফলাফলের জন্য, অন্যথায় এটি তো অর্থহীন কাজ হবে। ‘জলসার মাঝে ধর্মীয় অমুক কল্যাণ আছে এবং মানুষের চালচলন ও স্বভাবচরিত্রের ওপর এর অমুক অমুক ইতিবাচক প্রভাব আছে’- এ বিষয়টি যতক্ষণ বুঝা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এ জলসা শুধু অনর্থকই নয় বরং ‘এ সমাবেশ উত্তম কোনো ফল বয়ে আনে না’- এটি জানার পর এর আয়োজন এক প্রকার পাপ, ভ্রষ্টতায় নিপতিত হওয়া এবং জঘন্য বিদাত। বর্তমান যুগের কোনো কোনো পীরজাদার মতো শুধু বাহ্যিক জাঁকজমক দেখানোর জন্য আমি আমার অনুসারীদের কখনোই সমবেত করতে চাই না, বরং যে উদ্দেশ্যে আমি কোনো পন্থা সন্ধান করি তা হলো আল্লাহর সৃষ্টির সংশোধন। এরপরও যদি কোনো বিষয় বা ব্যবস্থা সংশোধনের কারণ না হয়ে বরং বিশৃঙ্খলার কারণ হয় তাহলে তার জন্য আমার চেয়ে বড়ো শত্রু

সৃষ্টিকুলে আর কেউ হবে না। আমার সম্মানিত ভাই হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব সাল্লামাহ্ তা'লা [আল্লাহ্ তা'লা তার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন—অনুবাদক] আমার নিকট অনেক বার উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের জামা'তের অধিকাংশ সদস্য এখনো নিজেদের মাঝে বিশেষ কোনো যোগ্যতা, সভ্যতা, পবিত্র চিন্তা, ধার্মিকতা ও পরস্পরের জন্য ঐশী ভালোবাসা সৃষ্টি করে নি।

সুতরাং আমি দেখছি, উক্ত মৌলভী সাহেবের কথা পুরোপুরি সঠিক। আমি জানতে পেরেছি, কিছু লোক জামা'তভুক্ত হয়ে এবং এ অধর্মের হাতে বয়আত করার পর 'তওবাতুন নসূহ' তথা পরিপূর্ণ তওবার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও তেমনই সংকীর্ণমনা রয়ে গেছে। যার জন্য তারা নিজ জামা'তের দরিদ্র লোকদের ছাগল-ভেড়ার ন্যায় মনে করে। সদাচার ও সহমর্মিতার আচরণ করবে তো দূরের কথা দম্ভের চোটে তাদের দিকে তাকিয়ে আসসালামু আলাইকুমও বলতে পারে না। তাদেরকে আমি এতটা নীচ ও স্বার্থপর পেয়েছি যে, তারা তাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্বার্থের জন্য ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হয় এবং একে অন্যের ওপর হাত উঠায়। সামান্য কারণে সব বিষয়ে একে অপরের ওপর চড়াও হয়, বরং কখনো কখনো তো পরিস্থিতি গালাগালির পর্যায়ে পৌঁছে যায় আর মনের মাঝে ঘৃণা ও ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং পানাহার সামগ্রীর প্রকারভেদ নিয়ে প্রবৃত্তির কামনাপ্রসূত বিতর্কে লিপ্ত হয়। যদিও আমাদের জামা'তে অনেক মহৎ ও পুণ্যবান লোকও আছেন, বরং (সংখ্যায় তারা) নিশ্চিতরূপে দুই শতাধিক হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'লার কৃপা রয়েছে, যারা বিভিন্ন হিতোপদেশ শুনে কাঁদেন এবং পরকালকে প্রাধান্য দেন। তাদের হৃদয়ে বিভিন্ন উপদেশের বিস্ময়কর প্রভাব পড়ে। কিন্তু এখন আমি সংকীর্ণমনা লোকদের কথা বলছি আর বিস্মিত হয়ে ভাবছি, হে আমার খোদা! এ কী? আমার সাথে এ কোন জামা'ত? এদের হৃদয় কেন প্রবৃত্তির কামনাবাসনার কাছে সিজদাবনত হয়? ভাই কেন অন্য ভাইকে কষ্ট দেয় এবং তার চেয়ে বড়ো হতে চায়? আমি সত্যি সত্যি বলছি, নিজ ভাইয়ের আরাম-আয়েশকে নিজের আরাম-আয়েশের ওপর যথাসম্ভব প্রাধান্য না দেওয়া পর্যন্ত মানুষ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না। আমার এক ভাই যদি দুর্বলতা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও আমার সামনে মাটিতে ঘুমায় আর সে যেন খাটে বসে না পড়ে সে আশঙ্কায় আমি যদি খাট দখল করে রাখি এবং না উঠি আর ভালোবাসা ও সহানুভূতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার খাটটি তাকে দিয়ে না দেই, এছাড়া

নিজের জন্য মেঝে পছন্দ না করি তাহলে আমার এ অবস্থার জন্য পরিতাপ! আমার ভাই যদি অসুস্থ ও কোনো ব্যথার কারণে নিরুপায় অবস্থায় পড়ে থাকে আর আমি যদি তার সামনে আরামে শুয়ে থাকি এবং তার জন্য সাধ্যমতো আরামের কোনো ব্যবস্থা না করি তাহলে আমার এ অবস্থার জন্য বড়োই পরিতাপ! আমার কোনো ধর্মীয় ভাই যদি প্রবৃত্তির তাড়নায় আমার সাথে রক্ষা আচরণ করে আর আমিও যদি তার সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ আচরণ করি তাহলে আমার এ অবস্থার জন্য পরিতাপ! বরং আমার তো তার কথায় ধৈর্যধারণ করা এবং তার জন্য নামাযে কেঁদে কেঁদে দোয়া করা উচিত ছিল।

কেননা সে আমার ভাই আর সে আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ। আমার ভাই যদি সরল প্রকৃতির হয় অথবা জ্ঞানের স্বল্পতা বা সরলতাবশত কোনো ভুল করে বসে তাহলে তার সাথে ঠাট্টা করা বা দ্রুতকৃত করে রাগের বহিঃপ্রকাশ করা কিংবা অসৎ উদ্দেশ্যে তার ছিদ্রাশ্বেষণ করা আমার জন্য ঠিক না, কেননা এ সবই ধ্বংসের পথ। কারো হৃদয় কোমল না হওয়া পর্যন্ত, নিজেকে অন্য সবার চেয়ে তুচ্ছ জ্ঞান না করা পর্যন্ত এবং সকল দাঙ্গিকতা দূর না করা পর্যন্ত কেউ সত্যিকার মু'মিন হতে পারে না। জাতির সেবক হওয়া সেবা পাবার যোগ্য হবার চিহ্ন এবং দরিদ্র মানুষের সাথে বিনীত হয়ে নম্র স্বরে কথা বলা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবার লক্ষণ আর মন্দের বিপরীতে ভালো করা সৌভাগ্যের প্রতীক, এছাড়া ক্রোধ ও কটুবাক্য হজম করা চরম বীরত্বের পরিচায়ক। কিন্তু আমি লক্ষ করছি, আমাদের জামা'তের কতিপয় লোকের মাঝে এসব বিষয় অনুপস্থিত। বরং কিছু লোক এমন অভদ্র যে, এক ভাই যদি নাছোড় হয়ে তার খাটে বসে থাকে তাহলে সে তাকে জোরপূর্বক উঠিয়ে দিতে চায় আর না উঠলে চৌকি উলটে দিয়ে তাকে নীচে ফেলে দেয়।* কিন্তু অপরজনও কম যায় না, সে তাকে জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং মনের সব ঝাল মেটায়। এই হলো অবস্থা যা আমি এ সমাবেশে প্রত্যক্ষ করি। এমনটি দেখার পর তো অন্তরটা জ্বলে যায় আর অবলীলায় হৃদয়ে এ বাসনা জেগে ওঠে যে, এসব আদম সন্তানের মাঝে বসবাস করার চেয়ে আমার জন্য

* টীকা: এসব কথা আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয় জামা'তের জন্য উপদেশস্বরূপ, এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই যে, কারো নাম উল্লেখ করে বলা হবে। অন্যথায় এটিই হবে সবচেয়ে বড়ো পাপ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পথ।

বনের হিংস্র প্রাণীদের মাঝে থাকা শ্রেয়। এত কিছু পরও আমি কোন সুখের আশায় জলসার জন্য লোকদের সমবেত করব? এটি তো জাগতিক কোনো তামাশা নয়। আমি জানি এখনো পর্যন্ত আমি একা তবে যাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত আছে এমন দুই শতাধিক লোকের ছোটো একটি বন্ধুমহল ছাড়া আর তাদের মাঝে সর্বপ্রথম ব্যক্তি হলেন আমার খাঁটি বন্ধু ও প্রিয়জন মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব। এছাড়া আরো কয়েকজন বন্ধুকে আমি চিনি যারা শুধুমাত্র আল্লাহর খাতিরেই আমার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখেন আর আমার কথা ও বিভিন্ন উপদেশকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন এবং তাদের দৃষ্টি পরকালের প্রতি নিবদ্ধ আছে। অতএব (ইহজগৎ ও পরজগৎ) উভয় জগতেই তারা আমার সাথে থাকবেন আর আমিও তাদের সাথে থাকব, ইনশাআল্লাহ। (অপরদিকে) আমার সাথে থাকা সেসব লোক সম্পর্কে আমি কী বুঝব যারা আমার সাথে আন্তরিক নয়, আমি যাঁকে চিনেছি তাঁকে যারা চেনে না এবং যাদের অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য স্থান পায় না আর হাসিঠাট্টা ও অপমান-অপদস্থ করার সময় যারা চিন্তা করে না যে, তিনি আমাদের দেখছেন এবং কখনোই ভাবে না যে, আমরা এমন এক বিষ পান করছি যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যু; আসলে তারা এমন লোক যারা আদৌ মন্দপথ ত্যাগ করতে চায় না। স্মরণ রেখো! যে আমার পথে চলতে চায় না তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আর তার দাবি মিথ্যা। এছাড়া যে আমার পথ নয় বরং নিজের পথকেই প্রিয়তর জ্ঞান করে তার সাথে আমার দূরত্ব পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্বের ন্যায়। তথাপি যে মনে করে, আমি তার সাথে আছি সে ভ্রান্তিতে নিপতিত। আমি বার বার বলছি, দৃষ্টিকে তোমরা পবিত্র করো আর সেগুলোকে আধ্যাত্মিকভাবে এমন আলোকিত করো যেভাবে তা বাহ্যিকভাবে আলোকিত। বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি তো পশুপাখিরও আছে। কিন্তু তখনই মানুষকে দৃষ্টিসম্পন্ন বলা যায় যখন সে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, অর্থাৎ পাপ-পুণ্য শনাক্ত করার যোগ্যতা লাভ করে এবং পুণ্যকর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতএব তোমরা তোমাদের চোখের জন্য কেবল চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় দৃষ্টিশক্তি অন্বেষণ না করে সত্যিকার দৃষ্টিশক্তির অন্বেষণ করো এবং নিজেদের হৃদয় থেকে জগৎরূপী প্রতিমাকে বাইরে ছুড়ে ফেলো, কেননা জাগতিকতা ধর্মের প্রতিপক্ষ। তোমরা অচিরেই মরবে আর দেখবে, তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত যারা জাগতিকতার মোহ থেকে মুক্ত এবং নিষ্পাপ ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী ছিল। তোমাদের অবস্থাও যদি এমনই

হয় তাহলে তোমাদের ও অন্যদের মাঝে পার্থক্যই বা কী থাকল?’— এসব কথা বলতে বলতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। কিন্তু এ হৃদয়গুলোর অবস্থা এমন যে, মনোযোগই দেয় না আর আমিও সেই চোখগুলোর কাছে (আধ্যাত্মিক) দৃষ্টি প্রত্যাশা করি না। কিন্তু আল্লাহ্ চাইলে হতে পারে। ইহজগৎ এবং পরজগতেও এমন লোকদের প্রতি আমি বীতশ্রদ্ধ। যারা আল্লাহ্ তা’লার বিধিনিষেধকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না এবং তাঁর প্রতাপ ও মর্যাদায় ভীত হয় না, এমন লোকদের বন্ধুত্ব অপেক্ষা জঙ্গলে একা বাস করাও আমার জন্য শ্রেয়। মানুষ যদি সত্যিকার ধার্মিকতা অবলম্বন না করে শুধু মৌখিকভাবেই দাবি করে, ‘আমি মুসলমান’ অথবা একজন ক্ষুধার্ত যদি কেবল মুখেই রুটি রুটি জপ করে তাহলে কী লাভ? এসব পস্থা অবলম্বনে সে মুক্তিও পাবে না আর তৃপ্তও হবে না। আল্লাহ্ তা’লা কি অন্তর্যামী নন? আর সেই সর্বজ্ঞ ও পরম প্রজ্ঞাময় খোদার গভীর দৃষ্টি কি মানব প্রকৃতির গভীরতম প্রদেশে পৌঁছে না?

অতএব হে অজ্ঞের দল! ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করো এবং হে উদাসীনের দল! খুব ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো, সত্যিকার ঈমান, নৈতিকতা ও কর্মকাণ্ডের পবিত্রতা ছাড়া কোনোক্রমেই মুক্তি নেই। সবদিক থেকে নোংরা জীবনযাপন করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান মনে করে সে আল্লাহ্কে নয় বরং নিজেকেই ধোঁকা দেয়। এমন লোকদের সাথে আমার কীসের সম্পর্ক যারা সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে ধর্মীয় শিক্ষা শিরোধার্য করে না এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জোয়ালের নিচে নিষ্ঠার সাথে নিজেদের ঘাড় পেতে দেয় না আর সততা অবলম্বন করে না এবং নোংরা অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া পছন্দ করে না, হাসিঠাট্টার বৈঠক পরিত্যাগ করে না, অপবিত্র চিন্তাধারা পরিহার করে না এবং মানবতা, ভদ্রতা, ধৈর্য ও নম্রতার পোশাক পরিধান করে না, বরং দরিদ্রদের কষ্ট দেয়, অসহায়-দুর্বলদের ধাক্কা দেয়, গর্বের সাথে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ায়, দাস্তিকতার সাথে চেয়ারে বসে থাকে এবং নিজেদেরকে বড়ো মনে করে। অথচ নিজেকে যে তুচ্ছ জ্ঞান করে সে-ই সত্যিকার অর্থে বড়ো। তারাই কল্যাণমণ্ডিত— যারা নিজেকে সবচেয়ে হীন ও ছোটো জ্ঞান করে। যারা লজ্জাবনত হয়ে কথা বলে, গরিবদুঃখী ও সহায়সম্বলহীন মানুষকে সম্মান করে এবং অক্ষমদের শ্রদ্ধা করে আর কখনো দুষ্কৃতি ও অহংকারবশত উপহাস করে না, এছাড়া নিজ কৃপালু প্রভুকে স্মরণ রাখে এবং ভূপৃষ্ঠে দীনহীনের ন্যায় পথ চলে। কাজেই আমি বার বার বলি, এমন মানুষের জন্যই নাজাত তথা মুক্তি

নির্ধারণ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি ইহজগতেই দুষ্কৃতি, দাঙ্কিতা, স্বার্থপরতা, গর্ব, জগৎপ্রেম, লোভ-লালসা ও কুকর্মরূপী নরক থেকে মুক্ত নয়— সে পরজগতেও এ থেকে কখনোই মুক্ত থাকবে না। আমি কী করব, কোথা থেকে এমন ভাষা আনব যা এই শ্রেণির লোকদের হৃদয়ে কার্যকর প্রভাব ফেলবে?

হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এমন শব্দমালা দান করো আর এমনসব বক্তৃতা ইলহাম করো যা তাদের হৃদয়কে আলোকিত করবে এবং নিজ প্রতিষেধক বৈশিষ্ট্যে তাদের বিষ দূর করবে। আমার হৃদয় সেই দিন দেখতে অধীর আগ্রহে ছটফট করছে যখন আমাদের এ জামা'তে ব্যাপক সংখ্যায় এমন লোক দেখব যারা আসলেই মিথ্যা পরিত্যাগ করবে এবং স্বীয় প্রভুর সাথে এক সত্যিকার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবে যে, তারা সকল প্রকার অনিষ্ট হতে নিজেদের রক্ষা করবে, সকল দুষ্কৃতির মূল অহংকারের সাথে স্থায়ী দূরত্ব সৃষ্টি করবে এবং স্বীয় প্রভুকে ভয় করতে থাকবে। কিন্তু বিশেষ কয়েকজন ছাড়া এমন চেহারা এখনও আমার চোখে পড়ছে না। হ্যাঁ! তারা নামায পড়ে ঠিকই কিন্তু জানে না 'নামায কী জিনিস'? হৃদয় বিনীত সিজদা না করা পর্যন্ত বাহ্যিক সিজদার ওপর ভরসা করা দুরাশা মাত্র। কুরবানীর রক্ত ও মাংস যেভাবে আল্লাহ তা'লার নিকট পৌঁছায় না বরং শুধু তাকওয়া পৌঁছায়, অনুরূপভাবে আন্তরিক রুকু, সিজদা ও কিয়াম ছাড়া দৈহিক রুকু ও সিজদার কোনো মূল্য নেই। হৃদয়ের কিয়াম করার অর্থ তাঁর নির্দেশাবলির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং রুকু করার অর্থ তাঁর প্রতি বিনত হওয়া আর সিজদা করার অর্থ নিজ সত্তাকে তাঁর তরে বিসর্জন দেওয়া। অতএব অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয়, আমি তাদের মাঝে এসব বিষয়ের কোনো প্রভাবই দেখি না। কিন্তু আমি দোয়া করি আর যতক্ষণ আমার মাঝে প্রাণবায়ু রয়েছে দোয়া করতে থাকব। আর আমার দোয়াটি হলো, হে খোদা! আমার এ জামা'তের লোকদের হৃদয়কে তুমি পবিত্র করো এবং স্বীয় কৃপার হাত প্রসারিত করে তাদের হৃদয়গুলোকে তোমার পানে ফিরিয়ে দাও আর তাদের হৃদয় থেকে সকল প্রকার দুষ্কৃতি ও হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দাও, এছাড়া তাদের পরস্পরের মাঝে প্রকৃত ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও। আমি বিশ্বাস করি, এসব দোয়া একদিন না একদিন গৃহীত হবে এবং আল্লাহ তা'লা আমার দোয়াসমূহ বিনষ্ট করবেন না। হ্যাঁ! আমি এ দোয়াও করি যে, আল্লাহ তা'লার জ্ঞান ও দৃষ্টিতে যদি আমার জামা'তের কোনো ব্যক্তি চির-দুর্ভাগা বলে বিবেচিত হয় যার অদৃষ্টেই লেখা নেই সে সত্যিকার পবিত্রতা

ও ধার্মিকতা অর্জন করবে, তাহলে হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! আমার প্রতিও তাকে সেভাবেই বিমুখ করে দাও যেভাবে সে তোমার প্রতি বিমুখ আর তার স্থলে অন্য এমন কাউকে এনে দাও যার হৃদয় কোমল এবং তার অন্তরে তোমার অশেষা আছে। এখন আমার অবস্থা এমন যে, বয়আতকারীদের আমি সেভাবেই ভয় পাই যেভাবে কেউ বাঘকে ভয় পায়। এজন্যই আমি চাই না, কেউ দুনিয়ার কীট থাকা অবস্থায় আমার সাথে সম্পৃক্ত হবে। অতএব এই হলো জলসা মূলত্ববির একটি কারণ যা আমি বর্ণনা করলাম।

দ্বিতীয় কারণ: এখনও আমাদের উপকরণ খুবই অপ্রতুল এবং প্রকৃত আত্মত্যাগীর সংখ্যাও অনেক কম। অপরদিকে নিষ্ঠাবান লোকদের অভাবে আমাদের বইপুস্তক প্রকাশনা-সংক্রান্ত অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। এছাড়া এই অবস্থায় জলসার এত বড়ো আয়োজন যাতে শত শত বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষের এখানে এসে কয়েকদিন অবস্থান করার এবং বিগত জলসার মতো দূরদূরান্ত থেকে আগত দরিদ্র যাত্রীদের পথখরচ দেবার আর শত শত লোকের কয়েকদিন ধরে যথাযথ আতিথেয়তা করার পাশাপাশি অন্যান্য আবশ্যকীয় কাজ যেমন- শত শত লোকের জন্য চৌকি ও অন্যান্য ব্যবস্থা করা এবং তাদের থাকার জন্য যথেষ্ট বাসস্থান নির্মাণ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য এখন আমারও নেই আর আমাদের নিষ্ঠাবান বন্ধুদেরও নেই। একথা সুস্পষ্ট যে, এসব উপকরণ সামগ্রী ঠিকঠাক করার জন্য হাজার হাজার রুপির প্রয়োজন আর যদি ধারকর্জ করেও এর ব্যবস্থা করা হয় তবে তা হবে অত্যন্ত গুরুতর একটি পাপ, কেননা ধর্মের জন্য যে-সব বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে তা উপেক্ষিত হবে। এছাড়া যা কারো মনেই থাকে না এমন খরচপত্রের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবার অর্থ হলো অযথা নিজের ওপর মোটা অঙ্কের ঋণের বোঝা চাপিয়ে নেয়া। কোনো জলসা না হওয়া সত্ত্বেও এখন আতিথেয়তার বিষয়টি এত ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, গত এক বছর ধরেই অবস্থা এমন যে, দৈনিক আগত অতিথির সংখ্যা কখনো ৩০-৪০ আবার কখনো তা শতকের কোঠায় গিয়ে পৌঁছায়, তাদের অধিকাংশই দেশের দূরদূরান্ত থেকে আসা হতদরিদ্র মানুষ, যাদেরকে ফিরে যাবার সময় পথখরচ দিয়ে বিদায় দিতে হয় আর এটি এখন নিত্যদিনের ঘটনা।

আমার শ্রদ্ধাভাজন মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব এর ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। দূরদূরান্ত থেকে আসা

অধিকাংশ অতিথিকে তিনি তাঁর নিজের গাঁট থেকে পথখরচ দিয়ে থাকেন। কোনো কোনো অতিথিকে তো প্রায় ৩০-৪০ রুপি পর্যন্ত দিতে হয়েছে আর ২/৪ রুপি তো সাধারণ ব্যাপার। কেবল এসব খরচই নয় বরং অতিথ্যেতা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রেও তিনি স্বীয় বদান্যতা ও উদারতার কারণে নিজের পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী আর্থিক সাহায্য ছাড়াও এ দিনগুলোতে প্রায় ৩০০-৪০০ রুপি স্বেচ্ছায় দিয়েছেন। এছাড়া বইপুস্তক প্রকাশনার অধিকাংশ ব্যয়ভারও তিনি নিজ দায়িত্বে বহন করছেন। কেননা বইপুস্তক ছাপানোর কাজও যথারীতি চলমান রয়েছে। এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়ের খাত থাকা সত্ত্বেও আমাদের নিজস্ব কোনো ছাপাখানার ব্যবস্থা এখনও হয় নি। যদিও উল্লিখিত মৌলভী সাহেব এসব সেবাকর্মে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত আছেন এবং আরো কয়েকজন বন্ধুও তাদের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী সেবা করে যাচ্ছেন। কিন্তু আর কতদিন এই সীমিত আয়ের মাধ্যমে এত বড়ো ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব? মূলত এসব কারণেই আমরা এ বছরের জলসা মূলতুবি রাখা সংগত মনে করছি এবং ভবিষ্যতে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর যা ইচ্ছা তা-ই হবে। কেননা তাঁর চাওয়া দুর্বল মানুষের ইচ্ছার ওপর প্রাধান্য পায়। আমি জানি না কী হতে যাচ্ছে আর এ-ও জানি না যে, আমার এ লেখাটি আল্লাহ তা'লার ইচ্ছাসম্মত নাকি তাঁর নিয়তিতে অন্য কিছু রয়েছে যা এখনও আমি জানি না?

وَأَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ هُوَ مُؤَلَّنَا نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔

[অর্থাৎ আমার এ বিষয়টি আমি আল্লাহ তা'লার সমীপে অর্পণ করছি আর তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি। কেননা তিনিই আমাদের অভিভাবক, তিনি কত-না উত্তম অভিভাবক এবং কত-না উত্তম সাহায্যকারী। -অনুবাদক।]

অধম গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রশংসায় লেখা বার্নাভা নিবাসী রহমত আলী সাহেবের ফার্সি কবিতার অনুবাদ

ای ذات تو کان گوهر علم دانی تو بیانی جوهر علم

হে প্রশংসিত ব্যক্তি! তোমার সত্তা জ্ঞানের মণিমাণিক্যের খনি,
তুমি জ্ঞানের উৎকর্ষের মূল্য জানো।

از علم دل تو گنج بر گنج و ز غامه کشاده در علم

তোমার হৃদয় হলো জ্ঞানের ‘হাফত গঞ্জ’* রত্নভাণ্ডারের খনি,
কলম দিয়ে তুমি জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিয়েছো।

علمت بذات روح پرور تو آمدی روح پرور علم

জ্ঞান নিজ সত্তায় প্রাণসম্বলিত
আর তুমি হলে জ্ঞানের প্রাণসম্বলিত।

تو نافه کشائی پرده راز تو نشر شمیم عنبر علم

তুমি গুপ্ত কঙ্করির রহস্য উন্মোচন করেছো
আর জ্ঞানের ‘আম্বার’ সুগন্ধি ছড়িয়ে দিয়েছো।

در دیده نشین تو مردم آما ای صدر نشین و سرور علم

চোখের কোটরে তুমি চোখের মনির মতো বসে আছো—
হে জ্ঞানের নেতা ও সভাপতি!

تو نور پیرایه دین احمد تو شمع منار و منبر علم

তুমি মহানবী (সা.)-এর ধর্মের প্রদীপের আলো,
তুমি জ্ঞানের বাতিঘর ও মিসরের প্রদীপ।

* টীকা: ‘হাফত গঞ্জ’ বলা হয় বাদশা খসরুর সাতটি ধনভাণ্ডারকে।— অনুবাদক

ایمان ز تو جیغ جیغ ابرو تو غازه رونی دهر علم

(তুমি) ঈমানী মর্যাদার অলংকার,
(তুমি) জ্ঞানপ্রেমীদের মুখের রক্তিম আভা।

تو مظهر آخرین منهم تو ازل حرف آخر علم

তুমি ‘আখারীনা মিনহুম’-এর বিকাশস্থল,
জ্ঞান ও হেদায়েতের শেষ যুগের সূচনা তুমি।

برشت رو هدئی نمودن امروز توئی چو رهبر علم

হেদায়েতের পথ দেখানো তোমার দায়িত্ব,
এখন তুমিই জ্ঞানের দিশারি।

اکنون تو کلاه ناز بر کن ای تاج مزین سر علم

এখন তুমি তোমার সম্মানের মুকুট সমুন্নত করো-
হে জ্ঞানের মাথার সুন্দর মুকুট!

دادی خبر وفات عیسیٰ کو بود نهان بدفتر علم

তুমি ঈসার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছ,
যা ইতিপূর্বে জ্ঞানের কিতাবে গুপ্ত ছিল।

فرخنده بمان که تازه کردی زبنده لباس دربر علم

ধন্য তুমি, কেননা তুমি পরিপাটি করেছো,
জ্ঞানের সুন্দর পোশাকটি।

آن وعده که عالم زمانه کردست بما ز داور علم

(তুমি) সেই বার্তা, যুগের আলেমরা যা
খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাদের জানিয়েছিল।

بینم به رخت نشان موعود گونیت مرا بصائر علم

তোমার চেহারায় আমি ‘প্রতিশ্রুত’, নিশানটি দেখতে পাই,
আমার মাঝে জ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও।

তু মহদি ও হাদী زمانی
তু عیسیٰ و خوش یتیمبر علم

তুমি যুগের মাহদী ও পথপ্রদর্শক;
তুমি ঈসা এবং জ্ঞানের মহান দূত।

در دست پنی گوی دجال
داری تو کشیده خنجر علم

দাজ্জালের গলায় তুমি হাত দিয়েছ,
আর জ্ঞানের খঞ্জর তুমি উদ্যত রেখেছো।

بر روهمه عالمان صورت
دارند حجاب اکبر علم

বিশ্বের সকল আলেমরূপী মানুষের চেহারা
জ্ঞানের বিশাল পর্দায় আবৃত।

آزما که هدایت ازل هست
آرند کشان کشان بر علم

যাদের ভাগ্যে আদিকাল থেকেই হিদায়াত নির্ধারিত ছিল,
তারা সেই মূর্ত জ্ঞানের দিকে ছুটে আসছে।

بر من نظرے ز چشم رحمت
ای روئے تو نیک منظر علم

হে প্রিয়! আমার দিকে কৃপার দৃষ্টি দাও,
তোমার চেহারা জ্ঞানের অপরূপ চিত্রপট।

من تشنه لب و فداوه در ره
تو ساقی آب کوثر علم

আমি একজন তৃষ্ণার্ত মানুষ এবং আমি তোমার দরজায় পড়ে আছি,
আর তুমি জ্ঞানের ‘কাওসার’-এর সুখা পরিবেশক।

لله تو مکن ز من دریغی
نوری ز مه منور علم

খোদার দোহাই! তুমি আমার কাছ থেকে সেই আলো লুকিয়ে রেখো না,
যা জ্ঞানের উজ্জ্বল চাঁদ থেকে বিচ্ছুরিত হয়।

Testimony of the Holy Quran

In Testimony of the Holy Quran, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^(as) of Qadian enumerates the Signs of Latter Days as described by the Holy Quran and demonstrates how the prophecies regarding the advent of the Promised Messiah are fulfilled in his person. He also explains the vital position of the Hadith in Islam and shows that these, too, inform us of the appearance of a reformer in this very age, making it incumbent upon today's Muslims to recognize their Imam.

In short, the topics covered in this book comprise the foundational arguments for one of the core tenets of the Ahmadiyya Muslim Community; namely, that the ahadith prophesying the advent of the Latter Day Messiah are indeed reliable and are supported by Quranic testimony.

